

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকবূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রফেসর ড. দুলাল কাণ্ঠি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নির্ভিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূলক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক শ্রেণির ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির হিন্দু ধর্ম পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা। এ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধান সমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত কিছু জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক গুণাবলি যেমন-সততা, উদারতা, কর্তব্যনির্ণয়, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্যবোধ জাগ্রত করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাঙ্গন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্নাত্বা ও সৃষ্টি	
	প্রথম পরিচেদ : স্নাত্বার স্বরূপ ও উপাসনা	১-১২
	দ্বিতীয় পরিচেদ : স্নাত্বা, সৃষ্টি ও সেবা	১৩-১৮
দ্বিতীয়	হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, উৎপত্তি ও বিকাশ	
	প্রথম পরিচেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস	১৯-৩২
	দ্বিতীয় পরিচেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৩-৪২
তৃতীয়	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান	৪৩-৫০
চতুর্থ	হিন্দুধর্মে সংক্ষার	৫১-৬০
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা	৬১-৭৬
ষষ্ঠ	যোগসাধনা	৭৭-৮৯
সপ্তম	ধর্মগত্ত্বে নৈতিক শিক্ষা	৯০-১০০
অষ্টম	ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা	১০১-১০৭
নবম	ধর্মপথ ও আদর্শ জীবন	১০৮-১২২
দশম	অবতার ও আদর্শ জীবনচরিত	১২৩-১৫১

প্রথম অধ্যায়

স্তো ও সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্তোর স্বরূপ ও উপাসনা

যিনি পরমপিতা, নিজেই নিজের স্তো, সর্বশক্তির উৎস যিনি, যাঁর ওপরে কেউ নেই, তিনি পরম স্তো-বিশ্বব্রহ্মাতের সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বনিমত্তা। সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের চেতনায় তাঁকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান।

ও



স্তোকে উপাসনার মাধ্যমে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আমাদের সকল কাজে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্তোকে স্মরণ এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা স্তোর স্বরূপ, সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্তোর ভূমিকা, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তিরূপে দেব-দেবীর পরিচয়, ঈশ্বর উপাসনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- নিরাকার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা ও অবতাররূপে স্তোর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- স্তোর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ও সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্তোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব
- দেব-দেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ- এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর উপাসনার ধারণা, ধরন (নিরাকার ও সাকার) ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং এর অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি প্রার্থনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং অর্থ বলতে ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব এবং ঈশ্বরের উপাসনায় উত্তুক হব
- ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা ও প্রার্থনা মন্ত্র অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : স্রষ্টার স্বরূপ—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার

সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর এসকল নাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.১. ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

ব্রহ্মারূপে স্রষ্টার স্বরূপ

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, ‘বৃহত্ত্বাত্ম ব্রহ্ম’। যাঁর থেকে বড় কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শুধু প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকেই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষাও করে থাকেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। আমরা জানি, ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আজ্ঞারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আজ্ঞা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।



ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ এবং তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অজ, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্঵ত। ব্রহ্মকে ‘ওক্ষার’ বলা হয়। ওক্ষার সংক্ষেপে ওঁ। এর পূর্ণরূপ অ-উ-ম। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।

ঈশ্বররূপে স্রষ্টার স্বরূপ

ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

তুমিদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্মস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেদামি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ । (১১/৩৮)

অর্থাৎ ‘তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞাতা। তুমি একমাত্র পরম স্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত’ একমাত্র প্রভু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোক থেকে সহজেই ঈশ্বরের মহিমা ও শক্তি প্রতীয়মান হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ঈশ্বর অনন্ত অসীম, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি শাশ্঵ত। তিনি জগতের আদি কারণ, তিনি বিধাতা। তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পরিব্রত। তিনি সকল

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

কর্মের ফলদাতা। যে যেরকম কর্ম করে, তিনি তাকে সেরকম ফল দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর নিরাকার। প্রয়োজনে তিনি সাকার হতে পারেন। কারণ অনন্ত তাঁর শক্তি। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন। খগ্বেদ অনুসারে তিনি পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মন্ত্রক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। এ কথার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতাই বোঝানো হয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি জ্যোতিঃস্মরূপ, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করেন।

১.২. স্মৃষ্টার স্বরূপ : ভগবান ও অবতার

ভগবানরূপে স্মৃষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, ঘৃণা, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে— যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কঞ্জনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয় (শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, ৬। ৫। ৭৯)। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের বিভিন্নভাবে কৃপা করে থাকেন। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ভগবান যে-কোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার ঈশ্বরাবেশে অপ্রাকৃত লীলা, দাবানল পান, একহাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ, পাষণ্ড-দলন এবং কঠোর তপস্যা করে সকলকে মুক্ত করেন এবং সকলের মঙ্গল করেন। সামান্য দেহধারী হয়ে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান তাঁর কাছে আসেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোট কথা ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

অবতাররূপে স্মৃষ্টার স্বরূপ

হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকার রূপে পৃথিবীতে অবিরুত্ত হওয়াকে বোঝানো হয়। এই সকল অবতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। অবতার শব্দটি তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে মর্ত্যে ঈশ্বরের অবতরণ।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যেমন নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরম সন্তা বা পরমেশ্বর থেকে উদ্ভৃত সকল অবতারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু অনেকবার অবতার হিসেবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিষ্ণু নয়বার অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের শেষে তিনি কঙ্কিরূপে দশম অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

ବିଶ୍ୱର ଦଶ ଅବତାର ହଜେ -

୧. ମହୀୟ
୨. ବୃଦ୍ଧ
୩. ବରାହ
୪. ନୃସିଂହ
୫. ବାଯନ
୬. ପରତରାମ
୭. ରାମ
୮. ବଲରାମ
୯. ବୃଦ୍ଧ
୧୦. କଳି

କଳି ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ବିଦ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଷୁଗେର ଶେଷେର ଦିକେ ତୌର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ଘଟିବେ ।

ଶ୍ରୀକଳି ଅଛି ମହାକାରୀ ଅବତାର ବଳତେ ପାଇଛି; ବ୍ରାହ୍ମକଣେ ଶ୍ରୀକଳି ନିରାକାର, ନିର୍ମୂଳ । ବ୍ରାହ୍ମ ସଖନ ଜୀବ ଓ ଜଗତେର ଉପର ଅତ୍ୱରୁ କରେନ, ତଥନ ତିନି ଈଶ୍ଵର । ଈଶ୍ଵର ନିରାକାର, ତଥେ ପ୍ରାଣୋଜନେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରତେ ପାଇନ । ଈଶ୍ଵର ସଖନ ଜ୍ଞାନେର ଭାକେ ସାଡା ଦେଲ, ତୌର କାହେ ଆସେନ, ନାନା ବ୍ରକ୍ଷମ ଶୀଳା କରେନ, ତଥନ ତାକେ ବଳା ହୁଏ ଭବନାନ । ଆବାର ମହାକାର କୋନୋ ଉତ୍ସବ୍ୟ ସାଧନେର ଜଳ୍ୟ ଈଶ୍ଵର ସଖନ ଜୀବବୂପ ଧାରଣ କରେ ପୃଥିବୀକେ ଅବତରଣ କରେନ ତଥନ ତାକେ ବଳେ ଅବତାର । ବ୍ରାହ୍ମ, ଈଶ୍ଵର, ଭବନାନ ଓ ଅବତାର ଆଲାଦା ନାହିଁ, ଏ ହଜେ ଏକଇ ସର୍ବପତ୍ରିଯାନ ଶ୍ରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମରେଇ ଡିଲ୍ ଡିଲ୍ ଅକାଶ ।



ପାଠ ୩ : ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର

ଭୂମିକା

ସ୍ରଷ୍ଟାକେ ଆମରା ବ୍ରକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ଆଆଁ, ପରମାଆଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୃତି ନାମେ ଡାକି । ତିନି ମହାବିଶ୍ୱେର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅପ୍ରାଣୀ ସବକିଛୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ମହାବିଶ୍ୱେ ଯା କିଛୁ ଆଛେ ସବକିଛୁଇ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି । ତିନି ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକେ ଭାଲୋବାସେନ, ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ, ବିପଦ-ଆପଦେ ରକ୍ଷା କରେନ, ପ୍ରୟୋଜନେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱନି କରେନ, ଦୁଷ୍ଟେର ହାତ ଥେକେ ସୃଷ୍ଟିକେ ରକ୍ଷା କରେନ । ତିନି ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକେ ସଂପଥେ ଚଲତେ ସହାୟତା କରେନ । ଯାଁରୀ ସଂପଥେ ଚଲେନ ଈଶ୍ୱର ତାଁଦେର ଭାଲୋବାସେନ । ତାଁଦେର ଉତ୍ସତିର ପଥ ଦେଖାନ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଁଦେର ମାବେ ବିରାଜ କରେନ । ଅସଂ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଈଶ୍ୱର ପଛନ୍ଦ କରେନ ନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦିଯେ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ ସଂ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ରକ୍ଷା କରେନ । ତିନି ତାଁର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେଇ ଅବହ୍ଵାନ କରେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିରୂପେ ବିରାଜ କରେନ । ଏ କାରଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିରାଜ କରଛେ । ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସେବେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁଳେର ଉପର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରେନ । ଜୀବ, ବନ୍ତ - ସକଳ କିଛୁର ତିନିଇ ନିୟନ୍ତ୍ରକ । ସ୍ରଷ୍ଟା ଛାଡ଼ା ସୃଷ୍ଟିକେ ଯେମନ କଲ୍ପନା କରା ଯାଯ ନା, ତେମନି ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ା ସ୍ରଷ୍ଟାକେଓ ଭାବା ଯାଯ ନା । ନିଚେ ସୃଷ୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା ବିଶ୍ଵଦଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୁଲୋ ।

୧. ଅଭିଭାବକ ହିସେବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା

ସ୍ରଷ୍ଟା ଛାଡ଼ା କୋନୋ କିଛୁଇ ସୃଷ୍ଟି ହୟ ନା । ଏ ମହାବିଶ୍ୱେର ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ତାରା, ଜୀବ-ଜନ୍ମ ସବକିଛୁର ଏକଜନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଛେନ । ତିନି ଈଶ୍ୱର । ତିନି ଅବିନଶ୍ୱର ଏବଂ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସେବେ ତିନି ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକେ ପରିଚାଳନା କରଛେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରଛେ । ତିନି ତାଁର ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଧାରଣ କରାରେଣେ ।

ଭାଲୋ କାଜେର ଜନ୍ୟ ତିନି ତାଁର ଭକ୍ତଦେର ଭାଲୋ ଫଳ ଦିଯେ ଥାକେନ ଏବଂ ଖାରାପ କାଜେର ଜନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଆବାର ମହାକାଶେର ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଯେ କକ୍ଷ୍ୟୁତ ହଚେ ନା, ତାର ମୂଳେଓ ରଯେଛେ ଈଶ୍ୱରେର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧାନେର ଶକ୍ତି । ଏ ସବ କିଛୁଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଆଦେଶେ ପରିଚାଳିତ ହଚେ । ଈଶ୍ୱର ବ୍ରକ୍ଷ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଏଇ ତ୍ୟୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ବିରାଜିତ । ବ୍ରକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟିର ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିପାଳନକାରୀ ଦେବତା ଏବଂ ଶିବ ସଂହାରେର ଦେବତା । ଏ ଥେକେ ବୋବା ଯାଯ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳାବନ୍ଦ କରାର ଜନ୍ୟ ତାଁର ନିର୍ଧାରିତ ଭୂମିକା ପାଲନ କରାରେଣେ ।

୨. ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହିସେବେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା

ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଏକଜନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଏକଜନ ଅସୀମ କ୍ଷମତାଧର ପରମପୁରୁଷ । ତାଁର ରଯେଛେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକ, ଅନ୍ତ ଚକ୍ର, ଅଗଣିତ ଚରଣ । ତିନି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱେ ସର୍ବଜୀବେ ପରିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଲକ୍ଷକୋଟି ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଏ ମହାକାଶେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହଚେ । ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ବନ୍ତ ସବକିଛୁଇ ଏକଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟେ ଆବଦ୍ଧ । ପରମ କାରଣବାଦେର ଯୌକ୍ତିକତା ଥେକେ ବିଚାର କରଲେ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବ୍ରକ୍ଷାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଯକର ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଚାଳିତ କରାରେ । କେନନା, ଏକାଧିକ ଈଶ୍ୱରେର ନିୟମ-କାନୁନଗୁଲୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହତୋ ଯା ସଂଘାତେର ସୃଷ୍ଟି କରତ । ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଏ ମହାବିଶ୍ୱେର ଏକଜନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହିସେବେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ପାଲନ କରାରେଣେ ।

ଅନେକ ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ଵକେର ମତେ, ବିଶ୍ୱ କୋନୋ କାରଣେର ଫଳାଫଳ । ପୃଥିବୀ ମାଟି, ଜଳ, ଆଲୋ ବାତାସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯା କୋନୋ ପରମ ଏକକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଫ୍ଟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରାଙ୍ଗ ପକ୍ଷେ ତା କରା ଅସ୍ତ୍ରବ ।

୩. ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଭୂମିକା

ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ରାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ।

ଅଭ୍ୟାସନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାଆନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ (୪/୭)

ପବିତ୍ର ଗୀତାର ଏ ଶୋକ ଥେକେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ ସଖନ ଏ ବିଶ୍ୱେ ଧର୍ମ କମେ ଯାଇ, ଅଧର୍ମ ବେଡ଼େ ଯାଇ ତଥନଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତେ ଅବତାରଙ୍ଗପେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହନ । ଏ ସମୟ ତିନି ଦୁଷ୍ଟକେ ଶକ୍ତିହାତେ ଦମନ କରେନ ।

୪. ଶାସକ ହିସେବେ ଭୂମିକା

ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାଲୋ କାଜେର ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାଜେର ଫଳାଫଳ ଅଶୁଭ । ଭାଲୋ ଓ ଖାରାପ ଅବଚେତନଭାବେ ହଦୟେ ବିରାଜ କରେ । ଏହି ଚେତନା ପରିଚାଳନା କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଏକଜନ ଶାସକେର । ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ । ତିନି ଭାଲୋ ମାନୁଷକେ ସୁଖୀ କରେନ, ଅପରାଧୀଦେର ଶାନ୍ତି ଦେନ ଏବଂ ସବକିଛୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେନ । ଅନ୍ତରକେ ପରିଚାଳିତ କରା, ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟକେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରା ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଶକ୍ତିର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନନ୍ଦ ।

ଈଶ୍ୱର ସକଳେର ହଦୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ସକଳକେ ପରିଚାଳନା କରେନ । ଈଶ୍ୱର ସକଳେର ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ବିଶ୍ୱେର କାରଣ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ।

୫. ଜନ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଭାଲୋ କାଜେର ଫଳଦାତା

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅପ୍ରାଣୀ ଯେ କୋନୋ ବିଷୟ ବା ପଦାର୍ଥ ଯେ-ହ୍ରାନ ଥେକେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବା ଧ୍ୱଂସର ମାଧ୍ୟମେ ଘାର କାହେ ଫିରେ ଯାଇ, ତିନିହି ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର । ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଉତ୍ତି ଥେକେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବକୁଲେର ସୃଷ୍ଟି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉଭୟରେ ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଯାତେ ଏ ଜଗତେର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକଟା ନିୟମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ପରିଚାଳିତ ହୟ । ତିନି ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ନରକ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ, ଯାତେ ମାନୁଷ ସଂ ପଥେ ଓ ସଂ କର୍ମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ କରତେ ପାରେ । ମନ୍ଦ କର୍ମ କରଲେ ନରକେ ଯେତେ ହୟ ।

ପାଠ ୪ : ଈଶ୍ୱରେର ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତି : ଦେବଦେବୀ

ଈଶ୍ୱର ଏ ମହାବିଶ୍ୱେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଲନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା । ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତିନଟି ପ୍ରଥାନ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରେ ଥାକେନ, ତା ହଲୋ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ । ତିନି ନିରାକାର, ଆବାର ପ୍ରୟୋଜନେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରେନ ।

ଦେବଦେବୀ ଈଶ୍ୱରେର ସାକାର ରୂପ । ଈଶ୍ୱର ନିଜେର କୋନୋ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତାକେ କୋନୋ ବିଶେଷ ଆକାର ବା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେନ - ଯେମନ ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ଵତୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ସକଳେଇ ଈଶ୍ୱରେର ବିଶେଷ ଶୁଣ ବା କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରେ ରହେନ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ବଲା ଯାଇ : ବ୍ରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟିର ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଲନକର୍ତ୍ତା, ସରସ୍ଵତୀ ବିଦ୍ୟାର ଦେଵୀ, ଶିବ ପ୍ରଲୟେର ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି । ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଦେବଦେବୀର ପୂଜା କରି, ଭକ୍ତି କରି, ତାଁଦେର କାହେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।



ଆଗେଇ ବଳା ହେଲେ, ଈଶ୍ଵର ବା ଭଗବାନ ପ୍ରଥାନତ ଛୟଟି ଶୁଣେ ଶୁଣାନ୍ତି- ଐଶ୍ୱର, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସଶ, ଶ୍ରୀ, ଜାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ।

ଦେବଦେବୀଗଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ଵର ନା ହଲେଓ ମହାନ ଈଶ୍ଵରେର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣେ ଶୁଣାନ୍ତି । କେବଳ, ତା'ରା ଈଶ୍ଵରେର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରେ ଆଛେନ । ଏ କାରଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କପେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀକେ ପୂଜା କରା ହୁଯ । ପୂଜାର ମଧ୍ୟମେ ଦେବତାରା ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହୁୟେ ପୂଜାରୀର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରେନ ।

ସୁତରାଂ ବ୍ରଙ୍ଗା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଦେବୀ ଏକ ଈଶ୍ଵରେର ବିଭିନ୍ନ ସାକାର ରୂପ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ନିଚେ କରେକଜନ ଦେବଦେବୀର ଐଶ୍ୱରିକ ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ବର୍ଣନା କରା ହଲୋ-

ବ୍ରଙ୍ଗା : ଈଶ୍ଵର ଯେ-ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ତା'ର ନାମ ବ୍ରଙ୍ଗା । ତିନି ବିଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ସବକିଛୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ । ବିଶ ସୃଷ୍ଟି କରା ଛାଡ଼ାଓ ବ୍ରଙ୍ଗା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ବାଞ୍ଛାନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶାନ୍ତର ଉତ୍ସାହକ । ତିନି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାଜ କରେ ଥାକେନ ।

ବିଷ୍ଣୁ : ତିନି ସୃଷ୍ଟିର ହିତ ଓ ପ୍ରତିପାଳନେର ଦେବତା । ଏ ବିଶେ ଯା କିଛୁ ଆଛେ ବିଷ୍ଣୁ ତା ପାଲନ ଓ ରକ୍ଷା କରେନ । ଦେବତାରା ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଦେର ଉଦ୍ଧାର କରେନ । ଦୁଷ୍ଟକେ ଦୟନ ଓ ଶିଷ୍ଟକେ ପାଲନ କରାର ଜନ୍ୟ ତିନି ବହୁରୂପେ ଏ ପୃଥିବୀତେ ଅବତାରଙ୍କପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ବିଷ୍ଣୁକେ ଶ୍ରମ କରିଲେ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଯ, ହୁଦଯ ପରିତ୍ରାଣ ହୁଯ ଓ ମନେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ।

ଶିବ ବା ମହେଶ୍ୱର : ତିନି ସଂହାର ବା ପ୍ରଳୟର ଦେବତା । ତିନି ସଂହାର କରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରେନ । ଏ ଛାଡ଼ାଓ ତିନି ଦେବତାଦେର ବିପଦ ଆପଦ ଥେକେ ରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନେ ଅସୁରଦେର ବିଲାଶ କରେନ । ତିନି ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନୃତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁ ବିଦ୍ୟାଯ ପାରଦଶୀୟ । ନାଟ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ପାରଦଶୀୟତାର କାରଣେ ତା'କେ ନଟରାଜ ବଳା ହୁଯ ।

ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା : ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ଈଶ୍ଵରେର ଶକ୍ତିରୂପ । ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ମହାମାୟାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀରୂପେ ଥକାଶିତ ହୁଁଛେନ ସେମନ - ଦୂର୍ଗା, କାଳୀ, ଜଗନ୍ନାଥୀ, କାତ୍ଯାରନୀ ପ୍ରଭୃତି । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ, ଯିନି ମହାବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧର୍ମରେ ହାତ ଥେବେ ରଙ୍ଗା କରାର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାକେ ଏ ମହାବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ହିସେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂଜା କରା ହୁଁ ।

ଦେବୀ କାଳୀ : ଦେବୀ କାଳୀ ଶାଶ୍ଵତ କ୍ରମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଆଧାର । ତିନି ଏକଦିକେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟଦିକେ ଧର୍ମ କରେନ । ଅପରଦିକେ ମହାମାୟୀ ମା ରୂପେ ଦେଲ ବରାତ୍ରି ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ : ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଧନ-ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ୟର ଦେବୀ । ତିନି ଆମାଦେର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରେ ଥାକେନ ।

ସରସ୍ଵତୀ : ତିନି ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ସଂକୃତିର ଦେବୀ । ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରି ।

ଗଣେଶ : ଶିଙ୍କି ବା ସଫଳତାର ଦେବତା । ଯେ-କୋନୋ ଉତ୍ତକାଜେ ବା ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶିଙ୍କିଦାତା ହିସେବେ ଗଣେଶର ପୂଜା କରା ହୁଁ ।

କାର୍ତ୍ତିକ : କାର୍ତ୍ତିକ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା, ତିନି ଦେବସେନାପତି । ତିନି ଅନ୍ୟାୟ, ଅଭ୍ୟାସର ଓ ଅବିଚାରେର ବିରଳକ୍ଷେତ୍ର ସୋଜାର ହେଁଯାର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେ ଥାକେନ । ଆଦର୍ଶ ଓ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଦେବତା କାର୍ତ୍ତିକେର ପୂଜା କରା ହୁଁ ।

ଶ୍ରୀତଳା : ତିନି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦେବୀ । ଦେବୀ ଶ୍ରୀତଳାକେ ସାଙ୍ଗ୍ୟବିଧି ପାଲନ ବା ପରିକାର-ପରିଚନ୍ତାର ଦେବୀଓ ବଲା ହୁଁ । ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ସାଙ୍ଗ୍ୟବିଧି ଓ ପରିକାର-ପରିଚନ୍ତା ବିଷୟେ ସଚେତନ ହୁଁ ଥାକି । ତିନି ମହାମାୟୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରାଣିକୁଳକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗେର ହାତ ଥେବେ ରଙ୍ଗା କରେ ଥାକେନ ।

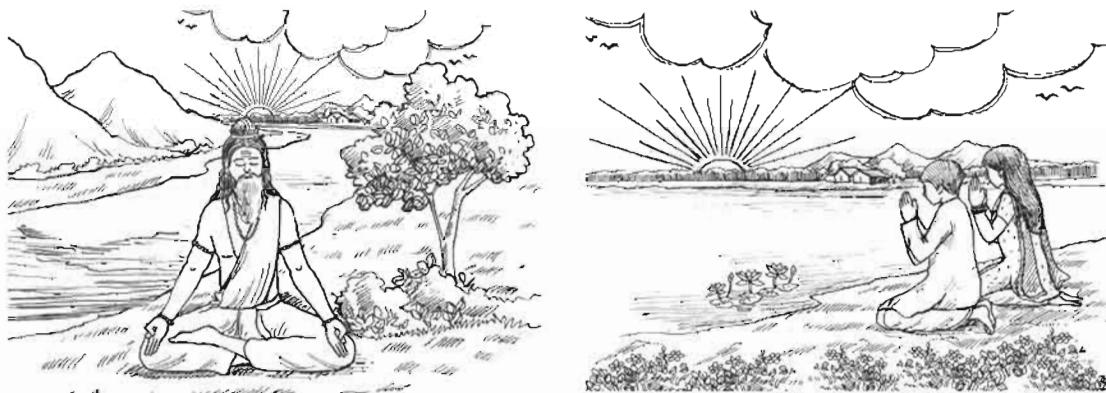
ପାଠ ୫ : ଉପାସନା

ଉପାସନାର ଧାରଣା

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମୂଳେ ରହେଣ ଭଗବାନ ଅୟ । ‘ଧର୍ମମୂଳୋ ହି ଭଗବାନ, ସର୍ବବେଦମରୋ ହରିଃ’ ଈଶ୍ଵର ଆଛେନ । ତିନି ଏକ ଓ ଅତ୍ୟତୀୟ । ତିନି ସକଳ ଜୀବେର ଅନ୍ତରାତ୍ମା । ସରକିଛୁଇ ତାଁର ଥେବେ ସୃଷ୍ଟି । ସୁତରାଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ । ଈଶ୍ଵର ଆମାଦେର ସୃଷ୍ଟି କରେହେନ । ତିନି ଆମାଦେର ପାଲନ କରେନ । ତିନି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ । ଆମାଦେର ମଜଳ-ଅମଜଳ ସବ ତାଁର ହାତେ । ତାଇ ଆମାଦେର ମଜଳେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଈଶ୍ଵରର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇ । ତାଁର ଶୁଣଗାନ କରି । ବିଶେଷ ପଞ୍ଜାତିତେ ଈଶ୍ଵରେର ଶୁଣଗାନ କରାର ରୀତିକେ ବଲା ହୁଁ ଉପାସନା । ଆକ୍ଷରିକଭାବେ ଉପାସନା ବଲତେ ଈଶ୍ଵରେର ପାଶେ ଅବହାନ କରାକେ ବୋବାନୋ ହୁଁ ।

ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ହଦୟ ଈଶ୍ଵରେର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଉନ୍ନ୍ତ ଥାକେ । ସେ ଈଶ୍ଵରେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ଵରେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଇ





ହଲୋ ପରମ ତୃଣି ଓ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ । ପରିବର୍ତ୍ତ ଧର୍ମଅଛୁ ବେଦେ ଈଶ୍ଵରେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭେର ବିଭିନ୍ନ ପଥେର କଥା ଉତ୍ସ୍ଲେଷ୍ଟ ରଖେଛେ । ଉପାସନା ଈଶ୍ଵରେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭେର ଏକଟି ମାଧ୍ୟମ ବା ପଥ ।

ଉପାସନାର ଧରନ

ଉପାସନା ସାଧାରଣତ ଦୁଇ ଧରନେର ହ୍ୟେ ଥାକେ । ଯଥା-

- କ. ସାକାର ଉପାସନା ବା ଧ୍ୱତୀକ ଉପାସନା
- ଘ. ନିରାକାର ଉପାସନା ବା ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା

ସାକାର ଉପାସନା ବା ଧ୍ୱତୀକ ଉପାସନା : ଧ୍ୱତୀକ ଶଦେର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନ ବା ଆକାର । ମୂଳତ ଏ ଧରନେର ଉପାସନା ବିଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀର ପ୍ରତିମାକେ (ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସରସ୍ଵତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରଭୃତି) ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ କରା ହୁଏ । ଧ୍ୱତୀକ ଉପାସନା ସଞ୍ଚାର ଉପାସନା ବା ଭକ୍ତିଯୋଗ ନାମେ ପରିଚିତ । ସଞ୍ଚାରକୁଳପେ ଈଶ୍ଵର ସାକାରଙ୍କୁଳପେ ଅବହ୍ଵାନ କରେନ । ଏ ସମୟ ତିନି ପ୍ରତିକୃତିତେ ପ୍ରକାଶିତ । ପୂଜା କରାକେ ସଞ୍ଚାର ଉପାସନା ହିସେବେ ବିବେଚନା କରା ହୁଏ ।

ନିରାକାର ଉପାସନା : ‘ନିରାକାର’ ଶଦେର ଅର୍ଥ ଯାର କୋନୋ ଆକାର ନେଇ । ମୂଳତ ଏ ଧରନେର ଉପାସନା ଧ୍ୟାନ ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମେ କରା ହୁଏ । ଜ୍ଞାନଯୋଗ ନିରାକାର ଉପାସନାର ଏକଟି ଅଂଶ । ଏ ଉପାସନା ଈଶ୍ଵରର କୋନୋ ପ୍ରତିକୃତିକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ କରେ କରା ହୁଏ ନା । ନିରାକାରଙ୍କୁଳ ଈଶ୍ଵର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବହ୍ଵାନ ଅବହ୍ଵାନ କରେନ । ତାକେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ତା'ର ଉପାସନା କରା ହୁଏ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବଲଦ୍ଧି କେଉ ନିରାକାର, କେଉବା ସାକାର ଉପାସନାର ମାଧ୍ୟମେ ଈଶ୍ଵରକେ ପୂଜା ବା ଆରାଧନା କରେନ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ଉତ୍ସ୍ଲେଷ୍ଟ କରାରେଣ :

ସେ ଯଥା ମାଁ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ତାତ୍ପ୍ରତ୍ୟେ ଭଜାମ୍ୟହୃ ।

ମମ ବର୍ଜାନୁବର୍ତ୍ତତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ପାର୍ବତ ସର୍ବଶଃ । (ଗୀତା ୪/୧୧)

ଅର୍ଥାତ୍ ଯାରା ଯେଭାବେ ଆମାକେ ଭଜନା କରେ ତାଦେର ସେଭାବେଇ ଆମି କୃପା କରେ ଥାକି । ମନୁଷ୍ୟଗଣ ସର୍ବପରାମରଶୀଳ ଆମାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ । ଦେବଦେଵୀଗଣ ଏହି ଈଶ୍ଵରେର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ । ତାହିଁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଏକେର ମଧ୍ୟେ ବହି ସମାବେଶ ବା ବହି ମଧ୍ୟେ ଏକେର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଟେଛେ ।

উপাসনার উপায়

উপাসনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এ উপায়গুলোর মধ্যে আছে পূজা করা, জপ ধ্যান বা যোগ সাধনা, তন্ত্র সাধনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও দেব-দেবীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ, প্রার্থনা মন্ত্র, পুস্পাঙ্গলি প্রদান, প্রণাম মন্ত্র পাঠ, আরতিগান, কীর্তন প্রভৃতি উপাসনার উপায় হিসেবে ধরা হয়। এ বাহ্য আচরণের মাধ্যমে মূলত অন্তরের ভক্তি, শুদ্ধা ও ভালোবাসা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রকাশ করা হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। সেগুলো আব্যুত্তি করে উপাসনা করা হয় বা প্রার্থনা জানানো হয়।

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

১. হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা : ঈশ্বরের উপাসনা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে।
২. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা : উপাসনা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে, মনের আবেগকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. ভক্তদের মনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সৃষ্টি করা : উপাসনা ভক্তদের ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে গভীর চেতনার সৃষ্টি করে।
৪. মানসিক অবস্থার উন্নতি করা : উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কুটিলতা দূর করে এবং মনকে শুদ্ধ করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্ব, হিংসা বিদ্যমান দূর করে।
৫. ভক্ত ও ঈশ্বরকে মুখোযুক্তি করা : উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে উপলক্ষ্য করতে পারে এবং গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে সে তাকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে।
৬. মোক্ষ লাভ : মোক্ষ অর্থ চিরমুক্তি। দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। কিন্তু পুণ্যবলে এক সময় আর দেহান্তর হয় না। তখন জীবাত্মাকে আর অন্যদেহে যেতে হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। একে বলে মোক্ষ, মোক্ষলাভ। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ, শেষে মোক্ষলাভ।

পাঠ ৬ : ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

উপাসনার একটি মন্ত্র :

যম্মাং পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্
যম্মানাণীয়ো ন জ্যায়োঽন্তি কিঞ্চিত্ ।
বৃক্ষ ইব স্তুত্বো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম् ॥ (শ্লেষ্মাশতর উপনিষদ ৩/১)

ସରଳାର୍ଥ : ଯା ଥେକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଅପକୃଷ୍ଟ ଆର କିଛୁ ନେଇ, ଯା ଥେକେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବା ବୃହତର କିଛୁଇ ନେଇ, ଯେ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ବୃକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚଲଭାବେ ସମହିମାୟ ବିରାଜିତ, ସେଇ ପୁରୁଷେର ଦ୍ୱାରାଇ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପରିବ୍ୟାଙ୍ଗ ।

ଉପାସନାର ଶିକ୍ଷା : ଏ ଶ୍ଲୋକ ଥେକେ ଆମରା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରି ତା ହଲୋ—
ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଶ୍ୱରେର ଚୟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର କିଛୁଇ ନେଇ । ତିନି ସବକିଛୁ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଏବଂ ତିନି ନିଜ ଗୁଣେ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତେ ବିରାଜ କରିଛେ । ତିନି ଛାଡ଼ା ଏ ଜଗତେ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉ ନେଇ ଅର୍ଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ । ଆମାଦେର ଉଚିତ ସବସମୟ ଈଶ୍ୱରେର ନାମ ଜପ କରା ବା ପ୍ରତିଦିନ ଏକବାର ଈଶ୍ୱରେର ମତ୍ର ବା ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରା, ଯାତେ ଆମାଦେର ମନେ ଈଶ୍ୱରେର ମହତ୍ତ୍ଵ ସର୍ବଦାଇ ପରିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାକେ ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ମତ୍ର

କେଶବ କ୍ଲେଶହରଣ ନାରାୟଣ ଜନାର୍ଦନ ।
ଗୋବିନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ମାଂ ସମୁଦ୍ର ମାଧବ ॥

ସରଳାର୍ଥ : ହେ କେଶବ, ହେ ଦୁଃଖଦୂରକାରୀ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ଜନାର୍ଦନ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ-ପରମାନନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ ଆମାକେ ଉଦ୍ଧାର କର ।

ଶିକ୍ଷା

ଭଗବାନ ବିକ୍ଷୁଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ତିନି ଜୀବ ଓ ଜଗତେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ଲୀଳା କରେଛେ । ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ କରେ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେଛେ । ତାର ଅନେକ ନାମ : କେଶବ, ନାରାୟଣ, ଜନାର୍ଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ ଇତ୍ୟାଦି । ତିନି ସବସମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଥାକେନ, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖେ ତିନି ବିଚଲିତ ହନ ନା । ତାଇ ତିନି ପରମାନନ୍ଦ । ତିନି ଜୀବ ଓ ଜଗତେର ଦୁଃଖ ହରଣ କରେନ, ଅର୍ଥାଏ ଦୂର କରେନ । ଆମରା ଜୀବେରୋ ଅନେକ ସମୟ ଜ୍ଞାତସାରେ ବା ଅଜ୍ଞାତସାରେ ଏମନ କାଜ କରି, ଯାତେ ପାପ ହୁଏ । ତାଇ ଆମାଦେର ପାପ କ୍ଷମା କରେ ଉଦ୍ଧାର କରାର ଜନ୍ୟ ଆମରା ତାର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇ । ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମତ୍ର ଥେକେ ଆରା ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯେ, ଈଶ୍ୱରେର କାହେ ପାପମୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହୁଏ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । କଲିଯୁଗେର ଅନ୍ତେ ଅବତାର ହିସେବେ କାର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଟିବେ ?

- | | |
|---------|----------|
| କ. କୃମ | ଘ. ବରାହ |
| ଘ. ବାମନ | ଘ. କଞ୍ଚି |

୨ । ଈଶ୍ୱରେର ସାକାର ରୂପ କାରା ?

- | | |
|------------------|----------------|
| କ. ମୁନି-ଧ୍ୟାନୀ | ଘ. ଦେବ-ଦେଵୀ |
| ଘ. ଯୋଗୀ-ସନ୍ନୟାସୀ | ଘ. ସାଧକ-ସାଧିକା |

৩। রোগ প্রতিরোধকারী দেবী কে?

- | | |
|------------|-----------|
| ক. লক্ষ্মী | খ. দুর্গা |
| গ. কালী | ঘ. শীতলা |

৪। পরমাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ পরমাত্মা -

- i. সাকার
- ii. মৃত্যুহীন
- iii. জন্ম ও মৃত্যুহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুমিতা দেবী ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গভীর ধ্যানে মঞ্চ থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ।

৫। সুমিতা দেবী কোন ধরনের উপাসনা করেন?

- | | |
|----------|------------|
| ক. সাকার | খ. নিরাকার |
| গ. সকাম | ঘ. সমবেত |

৬। নিয়মিত উপাসনার ফলে সুমিতা দেবীর -

- i. হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে
- ii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে
- iii. ঈশ্বরের সাম্রাজ্য লাভের প্রত্যাশা পূরণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শুভ্র ও তার মায়ের কথপোকথন-

- শুভ্র - মা, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয় কেন? দাদু মারা গেলেন কেন?
- মা - এটি মহাবিশ্বের একটি নিয়ম। এর মূলে রয়েছেন স্রষ্টা। তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি।
- শুভ্র - মা, ঈশ্বর কে? ব্রহ্মা, শিব না বিষ্ণু?
- মা - এঁরা সকলেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি এবং ঈশ্বরের সাকাররূপের প্রতিফলন। তাই আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি।
- ক. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি?
- খ. উপাসনা বলতে কী বোঝায়?
- গ. অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে তার মা স্রষ্টার কোন ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি- ‘ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন’- বিশ্লেষণ কর।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্নষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা স্নষ্টার স্বরূপ ও উপাসনা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ পরিচ্ছেদে স্নষ্টা, সৃষ্টি ও সেবা সম্পর্কে জানব। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

তিনি সকল কিছুর নিরাকার। তিনি এক ও অবিভািয়। তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। তাঁকে ঢাখে দেখা যায় না, তিনি নিরাকার। তিনিই জীবের মধ্যে আজ্ঞারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর, জীবের মধ্যে আজ্ঞারূপে ঈশ্বরের অবস্থান, এ সম্পর্কে একটি শ্লোক ও কবিতা এবং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

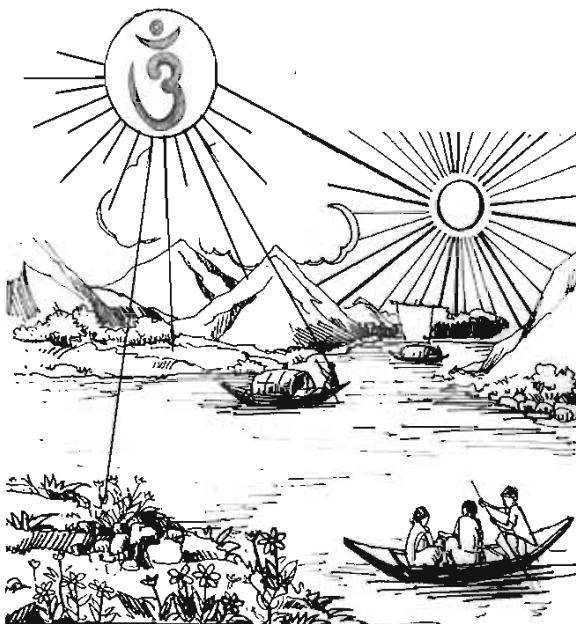
- সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের অন্তিম ব্যাখ্যা করতে পারব
- আজ্ঞারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে জীব ও জগতের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত একটি গীতিকবিতা ব্যাখ্যা ও এর শিক্ষা শনাত্ত করতে পারব
- ঈশ্বরজ্ঞানে জীব সেবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- জীব ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অন্তিম উপলব্ধি করতে এবং জীবসেবা ও পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বৃদ্ধ হব।



পাঠ ১ : সকল সৃষ্টির মূলে ইশ্বর

সুনীল আকাশ, পৃথিবী ও পৃথিবীর প্রকৃতি- সব মিলিয়ে বিচ্ছি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অনন্ত আকাশজুড়ে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী। পৃথিবীতে রয়েছে সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, আলো-বাতাস ও বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু।

সবকিছু মিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অঙ্ককার। তারপর এল আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এল গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, মানবকুল প্রভৃতি। এ সবকিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ইশ্বর। গীতায় বলা হয়েছে, তিনি পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়। এ বিশ্বে জীবকুল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ইশ্বর। আবার তিনিই জীবদেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী জীবাত্মা হিসেবে বিরাজ করছেন। তিনি জীবের জীবন, প্রাণীর প্রাণ, সর্বভূতের সনাতন বীজ। জীবদেহের ভেতরে যে জীবন আছে তা পরমাত্মারই অংশ। আজ্ঞা ছাড়া জীবদেহ অচল, মৃত। তিনি জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। কথাটি আরও একটু বুবিয়ে বলি: জীবদেহের মধ্যে



যখন ইশ্বর আত্মারূপে প্রবেশ করেন, জীবদেহ তখন চেতনাসম্পন্ন হয়, সচল, সক্রিয় হয়। যতদিন জীবাত্মারূপে তিনি জীবদেহে অবস্থান করেন, ততদিনই জীবের জীবন বা আয়ু থাকে। জীবাত্মা জীবদেহ পরিত্যাগ করলে জীবের মৃত্যু ঘটে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের বিনাশ ঘটে। তাই বলা হয়েছে ইশ্বরই আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তিনিই আমাদের চিন্তা, চেতনা ও সকল প্রচেষ্টার নিয়ন্তা।

ইশ্বর মানুষ ও জীবজন্তুর কল্যাণে অফুরন্ত সৌন্দর্যে ও সম্পদে ভরপূর এ সুন্দর পৃথিবী ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকৃতিতে বিরাজ করছে কত রকমের ফুল, কত রকমের ফল। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁরই সৌন্দর্য। সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলেও ইশ্বর রয়েছেন।

পাঠ ২ : আত্মারূপে ইশ্বর

স্বষ্টা বা ইশ্বর সর্বশক্তিমান। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্বষ্টাকে ব্রহ্ম, ইশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন। জগন্নাদের কাছে ইশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ। পরমাত্মার সকল গুণই জীবাত্মার

ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତାଇ ପରମାଆର ନ୍ୟାୟ ଜୀବାଆଓ ଜନ୍ୟ-ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲେଛେ, ଆଆର ସୃଷ୍ଟି ବା ବିନାଶ କୋନଟିଇ ସମ୍ଭବ ନୟ ।

ইনি নিত্য বিদ্যমান। ইনি জ্ঞানরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরের বিনাশ ঘটলেও, ইনি বিনষ্ট হন না (গীতা, ২/২০)। আত্মার দেহাত্মর ঘটে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-

‘বাসাংসি জীর্ণনি যথা বিহায় নবানি গুহ্নাতি নরোৎপরাণি ।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী'॥ (২/২২)

ଅର୍ଥାତ୍ ମାନୁଷ ପୁରାତନ କାପଡ଼ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଯେମନ ନତୁନ କାପଡ଼ ପରିଧାନ କରେ, ଆଜ୍ଞାଓ ତେମନି ପୁରାତନ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନତୁନ ଦେହେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଆଜ୍ଞାର ଏହି ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବଲେ ।

দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। আবার আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব। দেহইন আত্মা নিক্রিয়, আত্মাইন দেহ জড়। অর্থাৎ জড় বস্তুর আত্মা নেই, তাই নিশ্চল, প্রাণহীন ও ক্রিয়াহীন। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেও জানা যায়—আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন শাশ্঵ত, পুরাতন হয়েও চিরন্তনুন।

পাঠ ৩ : জীবের মধ্যে আত্মার উপরে অবস্থান সম্পর্কিত একটি মন্ত্র বা শ্লোক এবং উপরের অবস্থান সম্পর্কিত কবি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর গীতিকবিতা

শ্রীমদভগবদগীতায় বলা হয়েছে :

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ মধ্যস্থ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০/২০)

সরলার্থ : হে অর্জুন! আমি সকল প্রাণীর হন্দয়স্থিত আত্মা, আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

শিক্ষা : এখানে আদি বলতে জীব-জগতের উৎপত্তি, মধ্য বলতে তাদের স্থিতি এবং অন্ত বলতে তাদের মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। একথা উপলক্ষি করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসব ও সেবা করব। উল্লিখিত শ্লোকের আলোকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি-

আছ অনল-অনিলে

ভৃধর সলিল গহনে,

শশী তারকায় তপনে ।

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত কবিতাংশটি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর একটি গীতিকবিতার অংশ। এখানে সবকিছুর মূলে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থান করেন। কবি রঞ্জনীকান্ত সেন-এর এ গীতিকবিতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর অনল অর্ধাং অগ্নি, বায়ু ও চির

সুনীল আকাশে আছেন। এর অর্থ হচ্ছে – অগ্নির যে দাহিকা শক্তি, তা ঈশ্বরের শক্তি। বায়ু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। বায়ুর যে পতি, তার মূলে রয়েছে ঈশ্বরের শক্তি। আমাদের মাথার ওপরে যে সুনীল আকাশ, ঈশ্বর সেখানেও আছেন নীলিম সৌন্দর্যরূপে। একইভাবে ভূখরে মানে পর্বতের দৃঢ়তা, উচ্চতা ও মৌনতার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বর আছেন জলের গভীরতায়। তিনি বৃক্ষ, লতা, মেঘ, চন্দ, সূর্য ও তারকানাড়ির মধ্যেও বিরাজিত আছেন। এ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। রঞ্জনীকান্ত সেন এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন যে, ঈশ্বর সকল কিছুর মূলে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিজের মহিমা ও সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যেই সকল কিছু সুন্দর। তাঁর শক্তিতেই সকল কিছু শক্তিমান।

পাঠ ৪ : ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা

সাধারণ অর্থে ‘সেবা’ বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন- অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সঙ্গে বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমস্যে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃক্ষ করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বৃক্ষ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। ‘যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ’। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্মার্তি বিবেকানন্দ বলেছেন :

‘বহুক্লপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’

এ কথার তাত্পর্য এই যে, বহুক্লপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেঢ়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে তালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্ৰহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

হিন্দুধর্মে বৃক্ষ একটি জীব। বৃক্ষের মধ্যে প্রাণক্লপে ঈশ্বর বিরাজিত। তাই বৃক্ষের সেবা বা পরিচর্যা করার



বিষয়টিকে হিন্দুধর্মে প্রাচীন কাল থেকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আহারের শেষে কিছু অংশ বিভিন্ন প্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এই অংশ জীবকে দেওয়া হয়। এভাবেও জীবসেবা হয়।

হিন্দুধর্মে জীবসেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সেবাশ্রম, মঠ গড়ে উঠেছে যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। বিভিন্ন উপায়ে জীবসেবা করা হচ্ছে।

সকল জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত এবং ঈশ্বরের সন্তা প্রকাশিত। আমরা এ সত্য উপলক্ষ করে, সব ভেদাভেদ ভূলে জীবের সেবা করব।

অনুশীলনী

বহনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'আত্মা জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্঵ত, পুরাতন হলেও চির নতুন' – কে বলেছেন?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. শ্রীচৈতন্যদেব | খ. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ |
| গ. শ্রীকৃষ্ণ | ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণ |

২। ভক্তদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. ব্রহ্ম | খ. বৈষ্ণব |
| গ. ভগবান | ঘ. পরমাত্মা |

৩। জীবকে ভালোবাসার মূল কারণ হচ্ছে –

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| i. মেখানেই জীব সেখানেই শিব | ii. ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন |
| iii. জাগতিক কল্যাণ হয় | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অতীন্দ্র বাবু প্রতিদিন দুপুরে আহারের সময় একমুঠো ভাত তাঁর একটি কুকুরকে দিতেন। একসময় কুকুরটি তাঁর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে।

৪। অতীন্দ্র বাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে?

- | | |
|------------------|------------|
| ক. পশুপ্রীতি | খ. জীবসেবা |
| গ. কর্তব্যনিষ্ঠা | ঘ. অল্লদান |

৫। অতীন্দ্র বাবুর পক্ষে ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্বন্ধ, কারণ তাঁর বিশ্বাসে রয়েছে ঈশ্বর-

- i. সকল সৃষ্টির মূল
- ii. মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ
- iii. আত্মারপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

মৌমিতার বোনের জন্মের সাত দিন পরেই তার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। প্রিয় ঠাকুরমাকে হারিয়ে সে একা হয়ে পড়ে এবং মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে মা তাকে জীবাত্মা সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। মৌমিতা তা উপলক্ষ্মি করতে পেরে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।

- ক. ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে?
- খ. ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়?
- গ. অনুচ্ছেদে মৌমিতার মা কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন তা তোমার পর্যবেক্ষণের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মৌমিতার উপলক্ষ্মি তোমার পর্যবেক্ষণের আলোকে মূল্যায়ন কর।

ଦିତୀୟ ଅଧ୍ୟାଯ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ବିକାଶ

ଅଞ୍ଚମ ପରିଚେତ୍ : ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ

ଗଜୀଯ ବିଶ୍ୱାସେର ସମେ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଯେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ । ବିଶ୍ୱାସସମୂହର ମଧ୍ୟେ ଈଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଜେ ମୌଳ ବିଶ୍ୱାସ । ଈଥର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବର ବିଜ୍ଞାତି, ତିନି ଏକ, ଅଭିନ୍ନ, ଅନନ୍ୟ ପରମସଙ୍ଗ । ତିନି ନିଆକାର, ତବେ ପ୍ରଯୋଜନେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରାତେ ପାରେନ । ସେମନ - ଈଥରେର ଅବତାରଗତ ।



ଏହଦେର ଶର୍କ୍ରାନ୍ତୀଆଲୋର ଜନ୍ୟ ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହସେ ଥାକେ । ଆହରା ଜାନି ଈଥରେର କୋଣୋ କ୍ଷପ ବା ଶକ୍ତିକେ ଈଥର ଯଥିଲ ଆକାର ଦେଲ, ତଥିଲ ତାକେ ଦେବତା ବା ଦେବ-ଦେବୀ ବଲେ । ତମେ ଦେବ-ଦେବୀ ଓ ଅବତାରଗତ ସମ୍ବାହି ଏକ ପରମ୍ୟଦେଶରେ ବିଜ୍ଞତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶକ । ଦେବ-ଦେବୀର ଆବାଧନର ଯଥ୍ୟ ନିଯେ ତତ୍କ ଈଥରେର କର୍ମବୀ ପେଶେ ଥାକେ । କେନାଳୀ, ଈଥରେର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହିସେବେ ଦେବ-ଦେବୀର ଆବିର୍ତ୍ତାବ । ଆର ଅବତାରରଙ୍ଗେ ତୋ ଅଛାଏ ତଥବାନ୍ତି ପୃଥିବୀତେ ନେମେ ଆସେନ । ତାହି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେବୀ ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଥରେ ସାକାର ରୂପ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଜୀବନକେ ସାର୍ଵକ ଓ ଶୌରବମ୍ବ କରାର ଜନ୍ୟ ତ୍ରିକର୍ତ୍ତା, ଗାର୍ହର୍ତ୍ତ୍ଵ, ବାନଶବ୍ଦ ଓ ସମ୍ମାସ ଏହି ଚତୁରାଶମ ବା ଚାରାଟି କ୍ଷତ୍ରରେ କଥା ବଲା ହେବେ । କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ- ଏହି ବେ କୋଣୋ ଏକଟି ଶିଷ୍ଟାର ସମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଲେଇ ମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାତେ ପାରେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବଜ୍ରୀରା ସାଧନ ଜୀବନେର ଏହି ତରଫଳା ହେବେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର୍ଵକ କରେ ତୁଳାତେ ପାରେନ ।

ଏ ପରିଚେତ୍ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଏକେଶ୍ଵରବାଦ, ଅବତାରବାଦ, ଚତୁରାଶମ, ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଧାରଣାର ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରା ହେବେ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାଯ ଶେଷେ ଆମରୀ-

- ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିସେବେ ଏକେଶ୍ଵରବାଦେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ଅବତାରବାଦେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର, ଦେବ-ଦେବୀ, ଅଭୂତ ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଥରେର ପ୍ରକାଶ ବା ସାକାର ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମୂଳତ ବେ ଏକେଶ୍ଵରବାଦୀ-ଏ ଧାରଣାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ଚତୁରାଶମର ଧାରଣା (ତ୍ରିକର୍ତ୍ତା, ଗାର୍ହର୍ତ୍ତ୍ଵ, ବାନଶବ୍ଦ ଓ ସମ୍ମାସ) ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ଯୋଗେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ଧର୍ମବୋଧେ ଜାଗର୍ତ୍ତ ହବ ଏବଂ ଧର୍ମଚରଣେ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ହବ ।

পাঠ ১ : একেশ্বরবাদ

হিন্দুধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচার পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেখানে যেমন রয়েছে একেশ্বরের চিত্তা, ধ্যান-ধারণা, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন অবতার এবং বহু দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা-অচনার কথা।



এভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কি বহু ঈশ্বরবাদী? এ প্রশ্নের উত্তর হিন্দুধর্মগ্রন্থেই রয়েছে।

বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অবিভীয়। তিনি একাধিক নন। এই বে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, একেই বলে একেশ্বরবাদ। প্রচলিত বহু দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। তবে দেব-দেবীগণ ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের অধিকারী।

ঝগুবেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীর জ্ঞতি রয়েছে। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় বহন করলেও এঁদের সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্রটি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঝগুবেদে এ সম্পর্কে খবিদের উপলক্ষ্মি হচ্ছে : ‘একৎ সদ্ব বিপ্রা বহুধা বদন্তি’।

অর্থাৎ সদ্বন্দ্বন্ত এক, বিপ্রগণ তাঁকে বহুপ্রকার বলে বর্ণনা করেন। অনুক্রমভাবে, কঠোপনিষদে দেখা যায় ‘নেহ নানান্তি কিঞ্জন’(কঠ ২/১/১১) ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছু নেই। ব্রহ্ম এক এবং অবিভীয়। বিশেষ ঈশ্বরের সমান আর কেউ নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও একেশ্বরের কথা বলা হয়েছে। ‘প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্’- (গীতা-৯/১৮)। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে – তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তাঁর ধারা হিতি এবং তাঁতেই হচ্ছে লয়। তিনিই জগতের নির্ধান – আধার ও আশ্রয়।

সুতরাং অবতার ও দেব-দেবীগণ এক প্রমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ। এ কারণে উল্লেখ্য, দেব- দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য অর্জন করে তাতে এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটে।

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ସାଧନାର ମଧ୍ୟେ ଦେବ-ଦେବୀର ଆରାଧନା ଓ ବ୍ରକ୍ଷ ସାଧନାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ସମସ୍ତୟ ଚେତନା ରଯେଛେ । ସାକାର ଦେବୀ କାଳୀ ଓ ଯିନି, ନିରାକାର ଏକ ବ୍ରକ୍ଷ ଓ ତିନି । ଯିନି କାଳୀ, ତିନି ବ୍ରକ୍ଷ ।

ତାହଲେ ଦେଖା ଯାଚେ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ବହୁ ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଶୀଳିତ ହଲେଓ ମୂଲତ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରେରଇ ଉପାସନା କରା ହଚେ । ସୁତରାଂ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେବୀ ଏକଇ ଈଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ- ଏ ବିଶ୍ୱାସକେ ବଲା ହୁଏ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ । ଏଭାବେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଏକଟି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାବଳୟଦେର ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ବଲା ଯାଏ ।

ପାଠ ୨ ଓ ୩ : ଅବତାରବାଦ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଚେ ଅବତାରବାଦେ ବିଶ୍ୱାସ । ଅବତାର-ଏର ଅର୍ଥ ହଚେ ଉପର ଥେକେ ନିଚେ ନାମା ବା ଅବତରଣ କରା । ମୃଷ୍ଟା ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକେ ରକ୍ଷା କରାର ଜନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଖେନେ । ଧର୍ମେର ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ । ଧର୍ମକେ ଯିନି ରକ୍ଷା କରେନ, ଧର୍ମ ତାକେ ରକ୍ଷା କରେ ‘ଧର୍ମୋ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ’ ।

ତବେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜେ ମାଝେ ମାଝେ ଧର୍ମେର ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା, ଅବହେଲା ଦେଖା ଦେଇ । ଧାର୍ମିକଦେର ଜୀବନେ ନେମେ ଆସେ ନିପୀଡ଼ନ-ନିର୍ଯ୍ୟାତନ । ଦୁକ୍ଷତକାରୀଦେର ଅତ୍ୟାଚାର-ଅନାଚାର ସମାଜଜୀବନକେ କଲୁଷିତ କରେ ତୋଳେ । ଏକମ ଅବହାୟ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ ନେମେ ଆସେନ । ଏକେଇ ବଲା ହୁଏ ଅବତାର । ଆର ଅବତାର ସମ୍ପର୍କେ ଯେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା, ତା ଅବତାରବାଦ ନାମେ ପରିଚିତ ।

ଅବତାରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁକ୍ଷତକାରୀଦେର ବିନାଶ ସାଧନ, ସାଧୁ-ସଜ୍ଜନଦେର ଦୁଃଖ-କଟ୍ ଲାଘବ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂହାପନ କରା । ଏହି ଅବତାରବାଦେର ସୁଚନା ଲଙ୍ଘ କରା ଯାଏ ପୌରାଣିକ ଯୁଗେ । ଅନ୍ତ ଶକ୍ତିଧର ଈଶ୍ୱର ଜୀବେର ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଧାରଣ କରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ଏହି ଆବିର୍ଭାବେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରେର ଧାରଣାୟ କୋଣୋ ଛେଦ ଘଟେ ନା ।

ଈଶ୍ୱର ହଚେନ ଚୈତନ୍ୟମୟ ସତା । ତିନି ଚୈତନ୍ୟସ୍ଵରୂପ । ତିନି ଅସୀମ ସସୀମ ସକଳ ଅବହାୟତେଇ ଥାକତେ ପାରେନ । କାଜେଇ ଅବତାର ସସୀମ ହେଁ ଦେଇ ଧାରଣ କରେ ଏଲେଓ ତାର ମଧ୍ୟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଥାକେ । ଜୀବଦେଇ ଧାରଣ କରଲେଓ ତିନି ଏବଂ ଜଗତ କାରଣ ବ୍ରକ୍ଷ ଏକ ଏବଂ ତାଁର ଏହି ସ୍ତୁଲ ଦେଇ ଧାରଣ ଏକଟି ମାୟାର ଖେଲା ମାତ୍ର ।

ଏହି ଅବତାର ତିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ହେଁ ଥାକେ । ଯଥୀ- ଗୁଣାବତାର, ଲୀଲାବତାର ଓ ଆବେଶାବତାର । ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତିନ ଦେବତାଙ୍କପେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ବ୍ରକ୍ଷାଙ୍କେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର କରେନ । ଏରା ପରମେଶ୍ୱରେର ଗୁଣାବତାର । ଆବାର ପୃଥିବୀତେ ମଂସ୍ୟ, କୂର୍ମ, ବରାହ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ତୁଲ ଦେହଧାରୀ ଜୀବେର ମୂର୍ତ୍ତିତେ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ତାଁରା ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରେନ ତାକେ ଲୀଲାବତାର ବଲା ହୁଏ । ଶ୍ରୀଚିତେନ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରେର ଜ୍ଞାନାଦି ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ । ଏ ମହାପୁରାଣେର ଆବେଶାବତାର । ବିଷ୍ଣୁର ଦଶାବତାରେର କଥା ବଲା ହେଁବେ । ଏହା ହଲେନ- ମଂସ୍ୟ, କୂର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶ୍ରାମ, ରାମ (ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର), ବଲରାମ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଞ୍ଚି ।

ପୌରାଣିକ କାହିନି ଥେକେ ଜାନା ଯାଏ, ବେଦ ପ୍ରଳୟ ପଯୋଧି ଜଳେ ନିମିଶ ହଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଂସ୍ୟରୂପ ଧାରଣ କରେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରେନ । ଏରପର ପୃଥିବୀ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହଲେ କୂର୍ମରୂପେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକେ ପୃଷ୍ଠେ ଧାରଣ କରେନ । ଏହି କୂର୍ମାବତାର । ପୁନରାଯ ପୃଥିବୀ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହଲେ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କପେ ପୃଥିବୀକେ ଦଣ୍ଡେ ଧାରଣ କରେନ ।

নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অত্যাচারী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং রক্ষা করেন তত্ত্ব প্রহলাদকে। ভগবান বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাজা বলির দর্প চূর্ণ করেন। ক্ষত্রিয় প্রতাপে পৃথিবী নিপীড়িত হলে তিনি পরশুরামরূপে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়হীন করেন। অত্যাচারী রাজা রাবণের বিনাশ সাধন করেন শ্রীরামচন্দ্র অবতার। হলধর বলরাম হল কর্ষণ করে পৃথিবীকে অমৃতময় করেন। একইসঙ্গে তিনি অন্যায়কেও দমন করেন। বুদ্ধরূপে তিনি অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার নৈতিক শিক্ষায় সকলকে উদ্বৃদ্ধ করার প্রয়াসী হন। কলিযুগের শেষ ভাগে যখন অধর্ম ও অসত্যের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠবে তখন বিষ্ণু কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ধর্ম ও সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। অবতারের সংখ্যা অবশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, অবতার অসংখ্য। এখানে প্রধানত দশ অবতারের কথা বলা হয়েছে।

দশ অবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি স্বয়ং ভগবান। তাই তাঁকে বলা হয় মহা-অবতারী। দশ অবতারের মধ্যে দিয়ে তাঁরই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কবি জয়দেব রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে কৃষ্ণপ্রশংসিতে বলা হয়েছে-

“বেদকে তুমি করেছ উদ্বার,
বহন করেছ পৃথিবীর ভার,
দশন শিখরে ধারণ করেছ মেদিনী,
দৈত্যের অত্যাচার থেকে করেছ তাকে মুক্ত,
চূর্ণ করেছ ছলে বলির দর্প,
মুক্ত করেছ ধরণীকে ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে,
জয় করেছ দুর্জয় দশাননকে,
শ্যামল করেছ মেদিনীকে হল কর্ষণ করে,
মুক্ত অন্তরে বিলিয়েছ করুণা,
তুমই আবার আসবে শ্রেষ্ঠ নিধনক঳ে,
দশমূর্তিধারী হে কৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম।”



সুতরাং মৎস্য, কূর্ম, বামন প্রভৃতি ভগবানের অংশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্’— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ মানুষের ধারণার অতীত। তবে অবতার পুরুষের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজিত। অবতাররূপে দেহ ধারণ করে অসীম, অনন্ত সমীমরূপ ধারণ করে থাকেন। তাই হিন্দুদের নিকট অবতার স্বয়ং ভগবানেরই এক মুক্ত প্রকাশ। আর এ জন্যই হিন্দুরা অবতারকে ভগবৎ-শক্তির আশ্রয় হিসেবে ভক্তি-শৃঙ্খলা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অবতার ও দেব-দেবী একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রকাশ বা সাকার রূপ। এ অর্থে হিন্দুধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী।

পাঠ ৪ ও ৫ : চতুরাশ্রম

হিন্দুধর্মের দুইটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায় : ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য থাকে। ধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যা থেকে অভ্যন্তর অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও নিশ্চিত মঙ্গল লাভ হয় তার নাম ধর্ম। এ থেকে বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের ঋষিগণ মানব জীবনকে বিকশিত ও সার্থক করে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।



স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবিত থাকার সময় ধরা হয় একশত বৎসর। এই শত বর্ষের জীবনকে চারটি স্তরে বা আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি বিভাগের সময়সীমার গড় পঁচিশ বছর। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। দ্বিতীয় পঁচিশ বছর গার্হস্য আশ্রম। তৃতীয় পঁচিশ বছর বানপ্রস্থ আশ্রম এবং শেষ পঁচিশ বছরকে সন্ধ্যাস আশ্রম বলা হয়।

୧. ବ୍ରାହ୍ମଚରୀଶ୍ରମ

ପ୍ରତିଟି ଆଶ୍ରମେଇ ସୁନିମିଟ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ । ମାନୁଷେର ପୀଠ ବହର ବସନ୍ତ ହୁଲେଇ ତାକେ ଉତ୍ତମଗ୍ରୂହ ଗମନ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଚରୀ ଜୀବନ ଭର୍ତ୍ତର କରନ୍ତେ ହୁଏ । ତରଫରେ ନିକଟେ ଶୀଳାଅହଳ ଏବଂ ତରଫରେ ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟାବିଧାନେ ପେଣ୍ଡାଶୋଳା କରନ୍ତେ ହୁଏ । ଏଟୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଚରୀଶ୍ରମ । ଏ ଆଶ୍ରମେ ସେବକେ ଶିଖ୍ୟକେ ତରଫରେ ନିର୍ମେଣେ ବହ ଶୋଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମନ, ଆତ୍ମସଂସାଧନ, ପରିଶ୍ରମ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ଵାର ଜୀବନବାପନେ ଅଭ୍ୟାସ ହତେ ହୁଏ ।

ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଲେ ତରଫରେ ନିର୍ମେଣେ ନିଜ ମୃଦୁ ଧ୍ୟାନବର୍ତ୍ତନ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଚାରୀ ଗାର୍ହର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

୨. ଗାର୍ହର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଥମ

ବିବାହେର ଯାହାମେ ସନ୍ତୋଷ-ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ତାମେର ଭରଣ-ଶୋଷଣଶହ ପାରିବାହିକ ଜୀବନେ ପ୍ରତିଦିନ ପୀଠଟି ସଜ୍ଜ କରେଇ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତେ ହୁବେ । ଏହି ପୀଠଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲେ : ଶିତ୍ୟଙ୍କ, ଦୈବବଜ୍ଞ, ଭୂତବଜ୍ଞ, ନୃବଜ୍ଞ ଓ ଖବିଷଜ୍ଞ । ମାନୁଷ ଜ୍ଞାନାହଳ କରେ ଯାତ୍ରା-ପିତାର ଯାହାମେ । ଯାତ୍ରା-ପିତାର ତତ୍ତ୍ଵବିଧାନେ ଦେବ-ତତ୍ତ୍ଵର ବଢ଼ ହତେ ଥାକେ । ଯା-ବାବାର ଅତି ଶ୍ରୀକୃତି, ଭକ୍ତି, ଦେବା ବଜ୍ର ସନ୍ତାନେର ପ୍ରଥାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ କରାର ଯାହାମେ ଏକଜନ ସନ୍ତାନ ଶିତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଥାକେ ।

ମାନୁଷେର ଜୀବନ ଧାରାପେର ଜନ୍ୟ ଧର୍ମତିର ଦାନ ପ୍ରହଗ୍ନ କରନ୍ତେ ହୁଏ । ଏହି ଦାନେର କର୍ତ୍ତା ବା ଉତ୍ସ ହୁଲେ ବରାହ ଭଗବାନ । ଧର୍ମତିର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଭଗବାନେର ମହା ଧରାପିତ । ତାହିଁ ଧର୍ମତିଦର ବର୍ଷ ଭୋଗ କରାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଷ କୃତତ୍ଵ ତିଜେ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କେ ତାର ଭୋଗ୍ୟବଜ୍ଞ ନିବେଦନ କରେ ଥାକେ । ଏହି କର୍ମଟିକେ ବଳୀ ହୁଏ ଦୈବବଜ୍ଞ । ଭୂତବଜ୍ଞ ହେଲେ ପାଦିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜତ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ ମାନ୍ୟ ଥିବାର ଶରୀରୀ । ଅଭିଧି ଦେବାକେ ବଳୀ ହୁଏ ନୃବଜ୍ଞ । ପରାତିଗତଭାବେ ବେଦସହ ପ୍ରାଣୋଜନୀୟ ଧ୍ୟାନି ପାଠେର ଦାରୀ ଜୀବନ ଓ ଲୈତିକତା ଅର୍ଜନେର ଧର୍ମଟାକେ ବଳୀ ହୁଏ ଖବିଷଜ୍ଞ । ଥାଚିଲକାଳେ ଯୁନିକ୍ସିମିଦେର ନିକଟ ଥେବେ ଉତ୍ସ ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତେ ହତୋ ବଳେ ଏ ଯଜ୍ଞେ ନାମ ଖବିଷଜ୍ଞ ।

ମାନୁଷ ସମାଜବଜ୍ଞ ଜୀବ । ଜୀବନେର ପ୍ରାଣୋଜନୀୟ ଅନେକ ଧ୍ୟାନେ ସମାଜେର ନିକଟ ସେବେ ସମ୍ଭାବ କରନ୍ତେ ହୁଏ । ମାନୁଷ ତାର ଦୈନମିଦିନ ଚାହିଁ ଦେଇ- ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ଷ, ଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକେର ନିକଟ ସେବେ ପେଇସ ଥାକେ । ସାମାଜିକ ଚାହିଁଦାର କାରାପେ ମାନୁଷ ଅଠ, ଅନ୍ତିର, ଉପାସମାଲୟ, ବିଦ୍ୟାଶର୍ମ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଦାର ଇତ୍ୟାଦି ହାଶନେର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦେବାଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରେ । ଏ ସମ୍ଭାବ କରେଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମାଜେର ଅତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ଏଟିକେଇ ବଳୀ ହୁଏ ଗାର୍ହର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମେର କର୍ମ । ବ୍ରାହ୍ମଚରୀ ଶେବେ ବିବାହ କରେ ସଂସାରଧର୍ମ ପାଇନ ଗାର୍ହର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମେର ଅର୍ଜନ୍ତ ।



৩. বানপ্রস্থ আশ্রম

তৃতীয় পর্যায়ে আসে বানপ্রস্থ আশ্রমের কথা। সেখানে মানুষ সংসারের দায়-দায়িত্ব সন্তানের উপর ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে অবসর জীবনযাপন করে। এখানে সংসার জীবনের সঙ্গী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারেন তবে তাঁদের জীবন চর্চায় সংযম, ত্যাগ, নির্লোভ আচরণের বিধান থাকে। বানপ্রস্থে বনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ বনবাসী না হয়ে গৃহ ত্যাগ করে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সেবা বা পূজা-অর্চনার মাধ্যমে বৈরাগ্যময় জীবন-যাপন করতে পারে। এ পর্যায়ে ভজন, পূজন, কীর্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মীয় কর্মে মগ্ন থেকে বানপ্রস্থের জীবনস্তর কাটানো যায়।

৪. সন্ন্যাস

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবন ধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুর বেলার আহারের সামগ্ৰী লোকালয় থেকে সংগ্ৰহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্ৰহ করে ষষ্ঠ পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় ‘দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ’। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে-

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাৰ্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঞ্চ চাক্ৰিযঃ ॥ (৬/১)

অর্থাৎ, কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকৰ্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কৰ্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কৰ্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

শাস্ত্রীয় যুগবিভাগ অনুসারে বৰ্তমান যুগ কলিযুগ। এ সময়ে ব্ৰহ্মচৰ্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এ চার আশ্রমের অনুশীলন সম্ভব নয়। বৰ্তমানে ব্ৰহ্মচৰ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম নেই বললেই চলে। ব্ৰহ্মচৰ্য বৰ্তমানে ছাত্র জীবনে পৰ্যবসিত হয়েছে। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এ দুটি আশ্রম লক্ষ কৰা যায়। তবে গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রী, পুত্ৰ, কন্যা, মাতা, পিতা এদের পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্ৰহণে উৎসাহিত কৰা হয় না। তাই কলিযুগে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে জীবনযাপন কৰাই ভালো। এতেই মানুষের জীবন সাৰ্থক হয় এবং কল্যাণময় হয়।

পাঠ ৬ ও ৭ : যোগের ধারণা

যোগসাধনা মুক্তিলাভের একটি বিশেষ উপায়। ‘যোগ’ শব্দটি সাধারণভাবে সংযোগ অর্থাত ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগকে সংক্ষেপে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্ৰে এই যোগের অর্থ আৱশ্যক গভীরে নিহিত। জীবাত্মার সঙ্গে পৰমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা। যোগশাস্ত্রে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং

পতঞ্জলির যোগ দর্শনে বলা হয়েছে- ‘যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা হয়। মোক্ষ লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মাপলন্তি। আর এই আত্মাপলন্তির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ, স্থির ও প্রশান্ত মন বা চিত্তের স্থিতা।

মনকে শুদ্ধ ও শান্ত করার জন্য যোগদর্শনে আট প্রকার সাধনপ্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে; যেমন- ১. যম ২. নিয়ম ৩. আসন ৪. প্রাণায়াম ৫. প্রত্যাহার ৬. ধারণা ৭. ধ্যান ও ৮. সমাধি। এই আট প্রকার যোগাঙ্গ অনুশীলন করে একজন যোগী মুক্তিলাভ করতে পারেন। যোগাঙ্গলোর পরিচয় নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. যম : ‘যম’ শব্দটি মূলত সংযম অর্থ প্রকাশক। মুক্তিলাভের জন্য সাধক দৈনন্দিন জীবনে আচার-আচরণে সংযমী হবেন। তাকে অহিংসা, সত্য, অঙ্গেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ - এ পাঁচটি বিষয়ের অনুশীলন করতে হবে। এই পাঁচটিকে বলা হয় যম। দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা কোনো জীবকে হত্যা না করা বা নির্যাতন না করাকে বলে অহিংসা। যোগী পুরুষ বাক্যে কর্মে সত্যনিষ্ঠ হবেন। কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। আবার অঙ্গেয় বলতে বোঝায় অপরের জিনিস চুরি না করা। মনে যেন চুরি করার ইচ্ছাও না জাগে। সে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না, একে বলা হয় অপরিগ্রহ।

২. নিয়ম : শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি অনুষ্ঠান নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। শৌচ দুই প্রকারের : বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। স্নানাদির মাধ্যমে দেহ পরিচ্ছার-পরিচ্ছন্ন রেখে বাহ্যিক শৌচ লাভ হয়। আবার সৎ চিন্তা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি ভাবনার দ্বারা অভ্যন্তরীণ শৌচ লাভ হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষ। আবার শ্রদ্ধার সাথে শান্ত নির্ধারিত ব্রত উদ্যাপন করাকে বলে তপস্যা। বেদাদি ধর্মশাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করাই স্বাধ্যায়। ঈশ্বরকে সর্বক্ষণ চিন্তা করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

৩. আসন : দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন- পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যোগীপুরুষ নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে কোনো গুরু বা যোগীর নিকট এই আসন প্রক্রিয়া শিক্ষা করা দরকার। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অবেজ্জানিকভাবে আসন অভ্যাসে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. প্রাণায়াম : শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন- রেচক, পূরক এবং কুষ্টক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুষ্টক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

୫. ଅତ୍ୟାହାର : ଦେହେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ହତେ ଯୁକ୍ତ କରେ ଚିତ୍ତେର ଅନୁଗାମୀ କରାର ନାମ ଅତ୍ୟାହାର । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ହତେ ଯୁକ୍ତ କରା କଟ୍ଟସାଧ୍ୟ ବଟେ କିନ୍ତୁ ଅସାଧ୍ୟ ନୟ । ଦୃଢ଼ ସଂକଳନ ଓ ଅଭ୍ୟାସେର ବାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋକେ ଅନୁମୁଦୀ କରା ଯାଇ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋ ଅନୁମୁଦୀ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ବିଷୟ-ଆସଙ୍କି ନଟ ହୟ । ଏମତାବହ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ଲିବିଟ୍ ହତେ ପାରେ ।

୬. ଧାରଣା : ଅଭିଭୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟବଞ୍ଚିତେ ମନକେ ଧାରଣ ବା ହାପିତ କରାର ନାମ ଧାରଣା । ସମ୍ଭବ ବାହ୍ୟବଞ୍ଚି ପରିହାର କରେ ମନକେ ବ୍ରଦ୍ଧବଞ୍ଚିତେ ହାପନ କରତେ ହବେ । ଏଇ ବାରା ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତ ସୁମିତ ହୟ ।



୭. ଧ୍ୟାନ : ଧାରଣା ଓ ଧ୍ୟାନ ଦୁଇଟି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଯୁକ୍ତ । ଧାରଣାର ବାରା ମନକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ଛିର ରାଖା ଯାଇ । ଧାରଣାର ସେ ଛିର ଅବହ୍ୟାଟ ଧ୍ୟାନେ ଆରୋ ନିବିଡ଼ ହୟ । ସେ ବିଷୟେ ମନକେ ଛିର ରାଖା ହେଁଥେ ସେ ବିଷୟେ ଅବିଜ୍ଞନ ଭାବନାକେ ଧ୍ୟାନ ବଲେ । ଅବିଜ୍ଞନ ଧାରଣାଇ ଧ୍ୟାନ । ପରମତତ୍ତ୍ଵକେ ଉପଲକ୍ଷି କରାର ଜଳ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

୮. ସମାଧି : ଯୋଗ ସାଧନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭବ ହଜେ ସମାଧି । ଧାରଣା ମନକେ ଅଭିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାନୋର ସୁଯୋଗ କରେ ଦେଇ, ଆର ଧ୍ୟାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଅବିଜ୍ଞନ ଥାକେ । ସମାଧିତେ ଏସେ ଯୋଗୀର ଧ୍ୟାନଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଛିରତା ଆରୋ ଗଭୀର ହୟ । ସମାଧିତେ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଲୀନ ହରେ ଯାଇ । ସେ ସମୟ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତଟି ଛିର ନିକିରି ଅବହ୍ୟ ଉପ୍ଲିତ ହୟ । ତଥନ ଧ୍ୟାନ-କର୍ତ୍ତା, ଧ୍ୟାନେର ବିଷୟ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ତିନଟି ମିଶ୍ରିତ ହେଁୟ ଏକାକାର ହୟ ଯାଇ । ଏହି ଏକାକାର ଅବହ୍ୟ ଧ୍ୟାନୀର ନିଜଶ୍ଵ କୋନୋ ଅନୁଭୂତି ଥାକେ ନା; ଆରାଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିର ସଙ୍ଗେ ଏକିଭୂତ ହୟ ଯାଇ । ଏଟାଇ ସମାଧିର ଚରମ ଅବହ୍ୟ ।

ଉଚ୍ଚ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଭରଣ୍ଗଲୋକେ ଦୁଇଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଇ- ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନ ଏବଂ ଅନୁରଙ୍ଗ ସାଧନ । ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ଆଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାହାର ଏହି ପ୍ରାଚ୍ଚିଟିକେ ବଲା ହୟ ଯୋଗ ସାଧନାର ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନ; ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିକେ ବଲା ହୟ ଅନୁରଙ୍ଗ ସାଧନ । ଯୋଗସାଧନାର ମାଧ୍ୟମେ ଯୋଗୀ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରେ ଥାକେନ ।

ପାଠ ୮ ଓ ୯ : କର୍ମଯୋଗ

ମାନବ ଜୀବନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣି ଇଶ୍ୱର ବା ମୋକ୍ଷଲାଭ । ଧ୍ୟିଗଣ ଏହି ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଉପାୟ ହିସେବେ ତିନଟି ସାଧନ ପଥେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେ ଗେଛେ । କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏହି ସାଧନ ପଦ୍ଧତିଙ୍ଗଲୋର ଯେ କୋନୋ ଏକଟି ନିର୍ଣ୍ଣାର ସଙ୍ଗେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଏକଜଳ ସାଧକ ମୋକ୍ଷଲାଭ କରତେ ପାରେନ ।

୧୦ ଯା କିଛୁ କରା ହୟ ତାକେଇ ବଲେ କର୍ମ । ଆମରା ପ୍ରତିନିଯିତ ଜୀବନ ଧାରଣେର ଜଳ୍ୟ ଯେ-କାଜ କରି ତାର ସକଳଇ କର୍ମ । କର୍ମ ଦୂରକର୍ମ- ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିକାମ କର୍ମ । ସଥନ ବିଶେଷ କୋନୋ ଫଳେର ଆଶାମ କର୍ମ କରା ହୟ ତଥନ

তাকে বলে সকাম কর্ম। অর্থাৎ, কামনা বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে; এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা, কর্মের ফলও আমিই ভোগ করব। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন রকম। এখানে কর্তা কর্ম করেন কোনো রকম ফলের আশা না নিয়ে। তিনি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মফলও আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না। এই নিষ্কাম কর্মই যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বন্ধন হয়; আর নিষ্কাম কর্মে মোক্ষলাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভীষ্ট মোক্ষলাভ সম্ভব।

বৈদিক যুগে সকাম কর্মের সর্বোচ্চ ফলপ্রাপ্তি হিসেবে স্বর্গ লাভের কথা জানা যায়। পুণ্যফল ভোগের শেষে স্বর্গ থেকে চলে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। ‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি’ (গীতা)- পুণ্য ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদের খৰ্ষিগণ কর্ম ত্যাগ করে সন্ধ্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন। তাঁদের বক্তব্য - কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। এই কর্মফল ভোগের জন্য কর্মকর্তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হতে হয়। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সন্ধ্যাস গ্রহণ আবশ্যিক। এটা হচ্ছে সন্ধ্যাসবাদীদের মত।

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে উক্ত সন্ধ্যাসবাদীদের মত খণ্ডন করে বললেন, মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্মকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। যাঁরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় জাগতিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেন, তাঁরাও কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্ম অনুশীলন করতে থাকেন। মুক্তিলাভের সোপান হিসেবে সংঘর্ষ, নিয়ম, আসন ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করেন; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, আসন প্রভৃতি কর্ম তাদের চলতেই থাকে। তাহলে মুক্তিকামী সন্ধ্যাসীগণও কর্মকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন না।

কর্মই জীবন। জীবন ধারণের জন্য কর্ম করতেই হবে। তবে এই আবশ্যিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না। কর্মকে যোগে বা নিষ্কাম কর্মে পরিণত করতে হবে। মনে করতে হবে বিশ্ব জগৎ ঈশ্বরের বিরাট কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে সর্বক্ষণ ঈশ্বরেরই কর্ম হচ্ছে। আর এই কর্ম করার জন্য ঈশ্বর জীবদের নিয়োগ করেছেন। তবে ফলের আশায় নয়। ঈশ্বরের নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে কর্ম করা। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত এই কর্মই কর্মযোগ। কর্মফলকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেন্মু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূতি তে সঙ্গোহস্তুকর্মাণি ॥’ (২/৪৭)

অর্থাৎ, কর্মে তব অধিকার, ফলে কভু নয়। ফলাসক্তি ত্যাগ কর, কর্ম ত্যাজ্য নয়॥

কর্মযোগের নির্দেশ হচ্ছে-

কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়,

কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

১. কর্মকর্তাকে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। আমি কর্ম করছি, এরূপ অনুভূতি থাকবে না।

২. প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩. ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে।

৪. এরূপ কর্মে কর্মকর্তা অস্তরে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

୫. ତଥନ ଭଗବାନେର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ଏଭାବେ କର୍ମାନୁଶୀଳନ କରତେ କରତେ ଈଶ୍ଵରାନୁଗ୍ରହେ ମାନୁଷେର ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୁୟେ ଥାକେ ।

ପାଠ ୧୦ ଓ ୧୧ : ଜ୍ଞାନଯୋଗ

ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ ହଚ୍ଛେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ । ଜ୍ଞାନେର ଅନୁଶୀଳନ ଦାରୀ ପରମ ସଭାୟ ଉପମୀତ ହେଉଥାର ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନଯୋଗ । ଶାନ୍ତେ ଆତ୍ମତ୍ସ୍ଵ ଓ ପରମାର୍ଥତ୍ସ୍ଵ ଜ୍ଞାନକେ ଜ୍ଞାନ ବଲା ହୁୟେହେ । ଆର ଜ୍ଞାନେର ପଥେ



ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କାଳେ ଜ୍ଞାନର ସେ ସାଧନା ତାକେ ବଲେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ । ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତ ଓ ଜୀବେର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିଣତି ଜେଣେ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କାଳେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରେନ । ତିନି ଉପଲବ୍ଧି କରେନ, ତାଁର ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ବିଶେର ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟେ ଏକହି ଚେତନା ଅବହ୍ଵାନ କରାଛେ । ଜଗତେର ସବକିଛୁ ସେଇ ପରମ ଚେତନ୍ୟେର ଦାରୀ ଚେତନ୍ୟମୟ । ଏହି ଚେତନ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ।

ଜ୍ଞାନୀ ଆରା ଉପଲବ୍ଧି କରେନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ରମେହେ, ତା ବିଶ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା । ଜ୍ଞାନୀର ଦୃଷ୍ଟିତେ ପରମାତ୍ମାର ଅବହ୍ଵାନ ଧରା ପଡ଼େ ବିଶ ଚରାଚରେର ମଧ୍ୟେ । ତବେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ସେଇ ପରମତ୍ସ୍ଵ ଧରା ପଡ଼େ ନା । କାରଣ ହିସେବେ ବଲା ହୁୟେହେ, ଈଶ୍ଵରେର ମାଯା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଆଚନ୍ଦନ ଥାକେ । ତାର ନିକଟ ଆତ୍ମତ୍ସ୍ଵ ବା ପରମତ୍ସ୍ଵ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା । ତବେ ଈଶ୍ଵର-ଅନୁଗ୍ରହେ ସଥଳ ମାଯାର ପ୍ରଭାବ କେଟେ ଯାଇ ତଥଳ ଜୀବ ଆତ୍ମତ୍ସ୍ଵଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ହତେ ପାରେ । ଏଭାବେ ତାର ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ଜଣ୍ଣେ, ବାସନା ଶକ୍ତି ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାର ଆଚରଣ । ତଥନ ସାଧକେର ଅହଂକାର ଥାକେ ନା, ହିସା ଥାକେ ନା । ଶୁନ୍ଦେଶେବା, ଦେହ-ମନେ ପବିତ୍ର ଥାକା, ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟେ ଜ୍ଞାନାର ଆପଣ, କ୍ଷମା-ଏ ସକଳ ଶୁଣ ତାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଜ୍ଞାନୀର ବିଶ୍ଵାସ ଉପରେର ଉଲ୍ଲେଖ ରମେହେ । ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମତ୍ସ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଥାକେନ । ତାହି ତାର କର୍ମ ହୁଏ ନିଷ୍ଠାମ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ କର୍ମତ୍ସ୍ଵ ସମଜେ ତିନଟି କଥା ରମେହେ- କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ । ଶାନ୍ତିବିହିତ ସେ ସକଳ କର୍ମ କରତେ ହସ୍ତ ସେବଳୋକେ ବଲେ କର୍ମ । ଆର ଯା ଶାନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ସେବଳୋ ହଚ୍ଛେ ବିକର୍ମ । ଆର କୋନୋ କାଜ ନା କରାକେ ବଲା ହୁଏ ଅକର୍ମ । କର୍ମତ୍ସ୍ଵ ଗହିନ ଅବଶ୍ୟେର ମତୋ । ସେଥାନେ ଜ୍ଞାନୀ ତାଁର

জ্ঞানালোকে কর্তব্যকর্ম নির্ণয় করে থাকেন। আম অনুপীলনে মানুষের সমস্ত রকম সুখ, তাপ সূর হয়। তত্ত্ব যাই ইংরেজ প্রি পাত হলেও শীতাত্ত্ব জ্ঞানী তত্ত্বাত্ত্ব কর্তব্যান্বের বেশি প্রি (গীতা, ৭/১৭)। জ্ঞান অর্জনের জন্য শীতাত্ত্ব নির্দেশ হচ্ছে তত্ত্বশীল করণ নিকট উপর্যুক্ত হয়ে তাঁকে ধৰ্ম বদলা করতে হবে, সেবা কর্ম ধারা তাঁকে ছুট করতে হবে এবং বিনোক্তভাবে তাঁকে ধৰ্ম করতে হবে। সেবা কর্মে ছুট আজ্ঞাতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব তখন জ্ঞানাধীনকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

শ্রুত্বাবানু সততে জ্ঞানং তৎপুরঃ সহ্যতেন্ত্রিগ্রাঃ ।

জ্ঞানং সর্বাৎ পরাং শান্তিমত্তিরেণাধিগ্রহণ্তি ॥ (৪/৩১)

অর্থাৎ, যিনি শ্রুত্বাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপুর এবং হিতেন্ত্রিগ্রাম, তিনি জ্ঞান লাভ করে শীঘ্ৰই তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। আজ্ঞান লাভ

সহকেন্দেশে জ্ঞানযোগের ফল হচ্ছে :

১. আম পরম পরিচয়। সকল অশ্বিন্তাতেক সূর করে দেওয়ার ক্ষমতা আমের রয়েছে।
২. জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয়। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা ধৰ্ম করতে পারে না।
৩. জ্ঞানীর কর্ম বজল থাকে না। তাই জ্ঞানী পরম সূর্যে অবস্থান করেন। জ্ঞান লাভের জন্য আমরা সর্বাই যত্নশীল হব।

পাঠ ১২ ও ১৩ : ভক্তিযোগ

ভক্তিকে অবলম্বন করে বে ইংরেজ আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে তত্ত্ববানের সঙ্গে যোগসূত্র ইচ্ছা করা ভক্তিযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই হৃফ্তি। ভক্তি মানব জনপ্রের একটি সুরূপার বৃত্তি।

মারদীন ভক্তি সূত্রে বলা হয়েছে— তত্ত্ববানে ঐকাতিক প্রেম বা জ্ঞানোবাসাকে ভক্তি বলে। ইংরেজের প্রতি প্রেমভাবকে ভক্তি বলে। শান্তিল্য সূত্রে ভক্তিয় লক্ষ্য সরবরাহ বলা হয়েছে— তত্ত্ববানের পদে বে একান্ত রুচি, তারই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাদশ অধ্যাত্মের নাম ভক্তিযোগ। এর আগে কর্মজ্ঞানের কথা, তত্ত্ববানের বিজ্ঞতি ও বিশ্বজগনের পরিস্য পাওয়া গেছে। অর্থন তত্ত্ববান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগ মধ্য দিয়ে সংকল ইংরেজ সমক্ষে জেনেছেন।



বাদশ অধ্যাত্মের জন্মতে অর্জুনের মনে প্রথম জেগেছে— নির্মুণ, নির্বিশেষ, অঙ্গশ ব্রহ্মের সাধনা আৰ ব্যক্ত ইংরেজকে সাকারজগপে আরাধনা কৰার মধ্যে কোনটি উপর্যুক্ত পথ? উপরে তত্ত্ববান বলেছেন, সাধনার উভয় পথেই কেশ আছে। তবে অব্যক্ত ব্রহ্মচিত্তার চেয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিবান সাকার ইংরেজের আরাধনা কৰা অশেক্কাঙ্ক সহজ। ইংরেজকে বাঁচা সাকারে তত্ত্বময়জগপে আরাধনা করেন তাঁয়াই মূলত ভক্তি পথের সাধক। ভক্তিকে অবলম্বন করে যিনি সাধনা করেন তিনিই ভক্ত। ভক্ত সরবরাহ শীতাত্ত্ব বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি আসক্তি, ভয় ও

କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରେ ଈଶ୍ୱରେର ଶରଣାପନ୍ନ ହନ, ତିନି ଭଗବଦ୍ଭାବ ଲାଭ କରେନ । ତାର ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଥାକେ ନା । ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନେର ଅନୁଗ୍ରହ ପେଯେ ଥାକେନ । ଭଗବାନେର ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣଇ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ପ୍ରଧାନ କଥା । ତବେ ମନେ ରାଖା ପ୍ରଯୋଜନ, ଏ ଭକ୍ତିର ମୂଳେ ଥାକବେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ- ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତିନି କରଣାମୟ, ତିନି ଭକ୍ତବାଙ୍ଗ୍ଳା-କଳ୍ପତରଙ୍ଗ ।

ଗୀତାଯ ବହୁବିଧ ସାଧନ ପଥେର ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ସେ ସକଳ ପଥେ ସାଧନାୟ ନିଷ୍ଠା ଥାକଲେ ଈଶ୍ୱରେର କରଣା ଲାଭ କରା ଯାଯ । ତବେ କର୍ମଯୋଗେର ବା ଜ୍ଞାନଯୋଗେର ଯେ ପଥେରଇ ସାଧକ ହୋନ ନା କେନ, ସକଳ ପଥେଇ ଈଶ୍ୱରେର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରା ସ୍ଫୁରିବ । ଗୀତାଯ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଲେଛେ-

‘ଯେ ସଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତ୍ତେ ତାଙ୍କୁଥିବ ଭଜାମ୍ଯହମ୍ ।
ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ ॥’ (8/11)

-ହେ ପାର୍ଥ, ଯେ ଆମାକେ ଯେତାବେ ଉପାସନା କରେ, ଆମି ତାକେ ସେତାବେଇ ତୁଟ୍ଟ କରି । ମାନବଗଣ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଆମାର ପଥଇ ଅନୁସରଣ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ମାନବଗଣ ଯେ ପଥଇ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ନା କେନ, ସକଳ ପଥେଇ ଆମାତେ ପୌଛିବାକୁ ପାରେ ।

ଭକ୍ତିଯୋଗେ ଭକ୍ତେର ଚିନ୍ତା ଭଗବାନେର ଅଶେଷ କରଣା ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରାୟ ଥାକେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନକେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱରସ୍ଥଳ ମନେ କରେନ । ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ଗତି । ଏହି ଅନୁଭୂତି ନିଯେ ଭଗବାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣଇ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ପ୍ରଧାନ ତାବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଭଗବାନେ ଶରଣାଗତି ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭକ୍ତିଯୋଗେର ସାର କଥା ।

ନୂତନ ଶବ୍ଦ- ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ, ଚତୁରାଶ୍ରମ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଅବତାରତତ୍ତ୍ଵ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତିଯୋଗ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । ଜୀବାତ୍ମାର ସଜେ ପରମାତ୍ମାର ସଂଯୋଗକେ କୀ ବଲେ?

- | | |
|---------------|-------------|
| କ. ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର | ଖ. ଯୋଗସାଧନା |
| ଗ. ଯୋଗ ଦର୍ଶନ | ଘ. ଯୋଗାଙ୍ଗ |

୨ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶଦେର ଅର୍ଥ କୀ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| କ. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ | ଖ. କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ |
| ଗ. ଗୃହତ୍ୟାଗ | ଘ. ଭୋଗାକାଙ୍କ୍ଷା ତ୍ୟାଗ |

୩ । ଗାର୍ହସ୍ୟ କଲିଯୁଗେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସମ ଆଶ୍ରମ, କାରଣ-

- i. ଏର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ମାନୁଷ ସମାଜେର ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନ କରେ ।
- ii. ଜାଗତିକ ସକଳ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାତେଇ ମଧ୍ୟ ଥାକେନ ।
- iii. ଏତେ ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଓ କଳ୍ୟାନମୟ ହୁଯ ।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোবিন্দ বাবু একজন সাধারণ গৃহস্থ। সংসারে সন্তান প্রতিপালন ও অর্থ উপার্জন সকল ক্ষেত্রেই তিনি ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করে কর্ম করার চেষ্টা করেন। এটাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁর সন্তানরা নেবে কিনা এটা ভেবেও শক্তি হন।

৪। ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণে গোবিন্দ বাবুর মূল লক্ষ্য ছিল কোনটি?

- | | |
|----------|----------|
| ক. জ্ঞান | খ. ভক্তি |
| গ. মোক্ষ | ঘ. কর্ম |

৫। গোবিন্দ বাবুর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ কী?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ক. বিষয়প্রাপ্তি | খ. সন্তানপ্রাপ্তি |
| গ. ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তা | ঘ. ঈশ্বর সাধনায় মনোযোগহীনতা |

সূজনশীল প্রশ্ন :

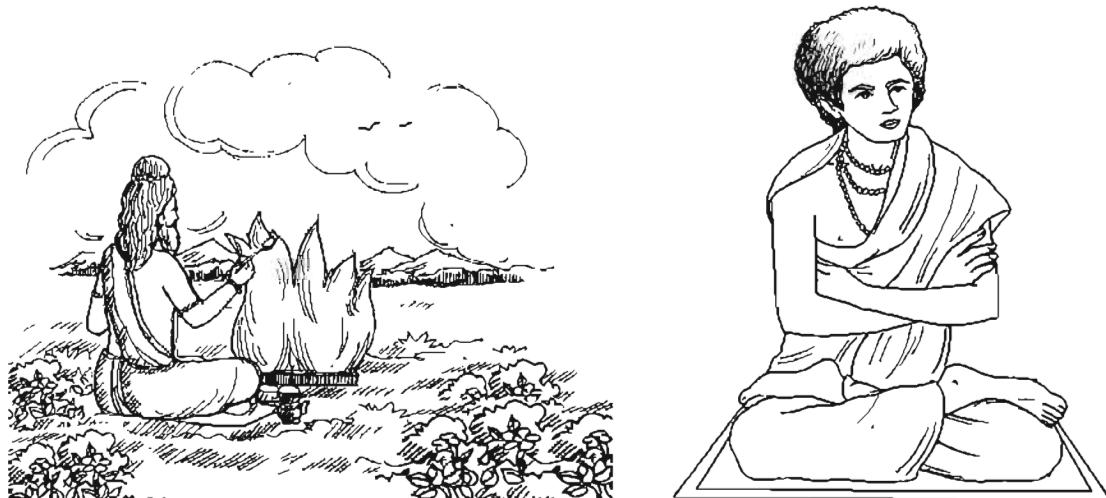
দিজেন্দ্রনাথ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর বয়স ৭৫ বছর। তিনি সংসারে থেকেও অত্যন্ত সংযমী। তিনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রের হাতে অর্পণ করে মন্দিরে মন্দিরে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এতেও তাঁর আত্মাত্পূর্ণ হয় না বিধায় তিনি জীবনের পরম প্রাণিতির উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

- ক. একেশ্বরবাদ কী?
- খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়?
- গ. দিজেন্দ্রনাথ সংসারে থেকে জীবনের কোন স্তরে অবস্থান করছেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘জীবনের পরম প্রাণি লাভে দিজেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তটি ছিল যৌক্তিক।’— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের প্রবর্তকরূপে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যায় না। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান শ্বয়ং। জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার কোন বিশৃঙ্খলা অতীতে হয়ত কোন আদিম মানবের মনে প্রথম ধর্মবোধ জেগে উঠে। সেখান থেকে এ ধর্মের যাত্রা শুরু।



মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এ ধর্মের বিকাশ ও প্রসার লক্ষণীয়। বহিরাগত আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রাগীর্থ ধর্মতত্ত্বের সংশ্লেষণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। হিন্দুধর্ম চিন্তায় একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, ইত্যরের শুণ ও শক্তি হিসেবে দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা পক্ষতির পরিচয় মেলে। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ, উপনিষদ (বেদান্ত), পুরাণ, গীতা, ভাগবতের প্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক চিন্তায়ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও সনাতন ধর্মের সংক্ষার ও ধর্মসাধনার নব নব রূপ লক্ষণীয়। রাজা রামযোহন রাম, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচুর জগদ্বজ্ঞ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, বাবা লোকনাথ, হরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র, এসি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ ধর্মগুরুর গৌরবময় অবদান হিন্দুধর্মকে আধুনিকতার পরিমন্ডলে উন্নীত করেছে। এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

এ অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার, সংক্ষার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্ম প্রচার, সংক্ষার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃক্ষ ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সমুল্লত রাখতে উদ্দৃষ্ট হব।

ପାଠ ୧ : ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଉତ୍ଥପତ୍ତି ଓ କ୍ରମବିକାଶ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଅପର ନାମ ସନାତନ ଧର୍ମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେ ପ୍ରଚଲିତ ଧର୍ମସମୂହରେ ଯଥେ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ତଥା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଏକାଥାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ନବୀନ । ପ୍ରାଚୀନ ଏ କାରଣେ ଯେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ସନାତନ ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରେଖେଛେ । ଆର ନବୀନ ଏ କାରଣେ ଯେ, ସନାତନ ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରେଖେଓ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଗେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ଖାପ ଖାଇୟେ ଚଲାଇଛେ । ଏ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସେବେ କୋନୋ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକେ ଚିହ୍ନିତ କରା ଯାଇ ନା । ଏ ଧର୍ମର ମୂଳେ ରାଯେହେନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାଃ । ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳ ଥେକେ ଏ ଧର୍ମଭାବର ପରିଚିତ ମେଲେ । ଦୀର୍ଘ ସାଂକ୍ଷେପିକ ଧର୍ମର ମୂଳଭାବକେ ଧରେ ରେଖେଓ ନତୁନ ନତୁନ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏ ଧର୍ମ କ୍ରମଶ ପଲ୍ଲବିତ ହେଯେଛେ ଏବଂ ହଜେ । ସିଙ୍ଗୁ ସଭ୍ୟତାର ମହେଶ୍ୱୋଦାଙ୍ଗୋ ଓ ହରଙ୍ଗାର ନିଦର୍ଶନ ଥେକେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିଚିତ ଓ ଧାରଣା ପାଞ୍ଚଙ୍ଗା ଯାଇ । ଆର୍ଯ୍ୟା ଏଦେଶେର ବହିରାଗତ ସମ୍ପଦାୟ । ତାରା ଯଥିନ ଭାରତ ଭୂମିତେ ଆସେ ତଥନ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ହିଲ ନିଜିର ଧର୍ମ ଓ ସଂକୃତି । ଏଦେଶେର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂଦର୍ଭ ଏବଂ ପରିଣାମିତିତେ ସିଙ୍ଗୁସଭ୍ୟତାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକଟା ସମସ୍ତୟ ଘଟେ । ଏର ଫଳେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଧର୍ମଚର୍ଚାର ସଙ୍ଗେ ଆର୍ୟଦେଇ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯାଇଲିତ ହେଯେ ଏକଟା ନତୁନ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରେ । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଆର୍ୟସଭ୍ୟତା, ଆର୍ୟଧର୍ମ ନାମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିକାରୀ ହିସେବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତା-ଚେତନାୟ ନତୁନତ୍ତ୍ଵର ସଂଧ୍ୟୋଜନ ଘଟେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଏହି ବିକାଶମାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ତିଳାଟି ମୁହଁ ବିନ୍ୟନ୍ତ କରେ ଦେଖା ଯାଇ- ବୈଦିକ ଯୁଗ, ପୌରାଣିକ ଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ।

ବୈଦିକ ଯୁଗ

ବୈଦିକ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଆଦି ଧର୍ମଥର୍ଥ । ବୈଦିକ ଧର୍ମଗ୍ରହସମୂହରେ ରମ୍ୟେହେ ଚାରଟି ଭାଗ : ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଏବଂ ଉପନିଷଦ । ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଭାଗ ନିଯମେ ବୈଦେର କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଆବାର ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଭାଗ ଦୁଟି ନିଯମେ ବୈଦେର ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ । ବୈଦେର ସଂହିତା ଅର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟି, ସୂର୍ୟ, ବକ୍ରଶ, ଉଷା, ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୃତି ଦେବ-ଦେଵୀର ତ୍ବ-ତ୍ଵତି ରମ୍ୟେହେ । ବୈଦେର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବଗଣେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାଗ୍ୟଙ୍ଗ କରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲାଭର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ହତୋ । ବୈଦ-ଯତ୍ନଙ୍କୋ ରହସ୍ୟମଯ ।

ସାଧାରଣେର ଜ୍ଞାନେ ଏଇ ତାତ୍ପର୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧରା ପଡ଼େ ନା । ତବେ ଯାଗ୍ୟଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଆର୍ୟଗମ ଦୁଇଟି ବଞ୍ଚିର ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାତେନ । ବଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ହଜେ- ଶ୍ରୀ ଓ ଦୀ ।



ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାଂ ଧନ-ଧାନ୍ୟ, ବଲ-ବିକ୍ରମ, ସଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ଥିବ କାମ୍ୟବସ୍ତୁ । ଧୀ ହଚେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା । ଆବାର ବେଦେର ଅନ୍ୟ କତଙ୍ଗଲୋ ମନ୍ତ୍ରେର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି, ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତିଃ, ଅମୃତତତ୍ତ୍ଵ । ଏ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ ପ୍ରକଟିତ ହେଯେ । ଧର୍ମେର ସଂଜ୍ଞାଯ ଜାନା ଯାଇ ଯା ଥେକେ ଜାଗତିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ହୁଏ ପୋତିଇ ଧର୍ମ । ଏହି ସନାତନ ତଥା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ବୈଦିକ ଯୁଗେର ଖ୍ୟାତିର ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଚେତନାଯ ଜାଗତିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଉଭୟବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଜନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ । ବୈଦିକ ଯୁଗେ ଖ୍ୟାତିର ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଚେତନାଯ ଜୀବନବାଦୀ, ଜୀବନବାଦୀ । ବାଜସନ୍ୟେ ସଂହିତାଯ ବଲା ହେଯେ-

ତେଜୋଽସି ତେଜୋ ମଯି ଧେହି । ବୀର୍ଯ୍ୟମସି ବୀର୍ଯ୍ୟ ମଯି ଧେହି ।

ବଲମସି ବଲଂ ମଯି ଧେହି । ଓଜୋଽସ୍ୟୋଜୋ ମଯି ଧେହି ।

ମନ୍ୟରମସି ମନ୍ୟଂ ମଯି ଧେହି । ସହ୍ୟୋଽସି ସହ୍ୟଂ ମଯି ଧେହି ।

ଅର୍ଥାଂ ତୁମି ତେଜସ୍ସରପ, ଆମାକେ ତେଜ ଦାଓ, ଆମାକେ ତେଜସ୍ୱୀ କର । ତୁମି ବୀର୍ୟସ୍ସରପ, ଆମାଯ ବୀର୍ୟବାନ କର । ତୁମି ବଲସ୍ସରପ, ଆମାଯ ବଲବାନ କର । ତୁମି ଓଜୋଽସ୍ୟୋଜୋ, ଆମାଯ ଓଜସ୍ୱୀ କର । ତୁମି ମନ୍ୟ ସ୍ସରପ (ଅନ୍ୟାଯଦ୍ରୋହୀ), ଆମାଯ ଅନ୍ୟାଯଦ୍ରୋହୀ କର । ତୁମି ସହ୍ୟସ୍ସରପ (ସହଶକ୍ତି), ଆମାଯ ସହନଶୀଳ କର ।

ବୈଦିକ ଯୁଗେର ପ୍ରାର୍ଥନାଯ ଦେଖା ଯାଇ ଜୀବନେ ସମ୍ବନ୍ଧି, ଜୀବେର ପ୍ରତି ମେହ-ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଜଗତେର ଶାନ୍ତି କାମନା । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଗୁଲୋର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏକ ପରମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ହେଯେ । ଏକେ ଦ୍ୱାରା ବଲା ଯାଇ । ଏଥାନେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ବୈଦିକ ଯୁଗେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନେର ରୂପ ଛିଲ ଯଜ୍ଞକ୍ରିୟା । ଯଜ୍ଞକର୍ମେର ଅନୁଶୀଳନ କରେ ମାନୁଷ ଅଭୀଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ଲାଭ କରତେ ପାରନେନ । ଏହିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ବଲା ହଲୋ ଯାଗ-ଯଜ୍ଞାଦି କାମ୍ୟକର୍ମ, ଜୀବେର ସଂସାର ବନ୍ଧନେର କାରଣ । ଏଗୁଲୋ ମୋକ୍ଷଲାଭେର ସହାୟକ ନୟ । ଯଜ୍ଞକର୍ମ ସୁତ୍ତୁଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହଲେ ଯଜ୍ଞକାରୀର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ଏମନକି ସ୍ଵର୍ଗପ୍ରାଣିଓ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହଲେ ଜୀବକେ ସ୍ଵର୍ଗଭୋଗ ଛେଡ଼େ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରତେ ହୁଏ । ମାନବ ଜୀବନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଚେ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବା ମୋକ୍ଷଲାଭ କରେନ, ମୋକ୍ଷଲାଭି ଜୀବନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ କାମ୍ୟକର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସନ୍ନ୍ୟାସଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରତେ ହେବେ । ଏଥାନେ ସନାତନ ଧର୍ମଚିନ୍ତାଯ ନତୁନ ଉପଲବ୍ଧି ଏସେ ଯାଇ । ମୋକ୍ଷଲାଭେର ସହାୟକ ଧର୍ମଚିନ୍ତା ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦେର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ଘଟେ । ଏ ସ୍ତରେ ଯୁକ୍ତିଲାଭେର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସେବେ ବହୁ ଉପନିଷଦ ପ୍ରତି ରଚନା ହୁଏ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶତ୍ରେରେ ଅଧିକ ଉପନିଷଦେର ପରିଚୟ ଜାନା ଗେଛେ । ତବେ କୌଷିତକୀ, ପ୍ରତରୋଯ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିଶ, କେନ, କଠ, ତୈତ୍ତିରୀଯ ପ୍ରତ୍ୱତି ବାରୋଟି ଉପନିଷଦକେ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବଲା ହୁଏ । ଏଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମତଭେଦ ରଯେଛେ । ବ୍ରକ୍ଷଲାଭେର ପଥ ସୁଗମ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହର୍ଷି ବାଦରାଯଣ ବେଦବ୍ୟାସ ‘ବ୍ରକ୍ଷସୂତ୍ର’ ଗ୍ରହେ ସମସ୍ୟ ସାଧନେର ଚେଷ୍ଟା କରେଛେ । ଏକେଇ ବଲା ହୁଏ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ।

ଏଥାନେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ବ୍ରକ୍ଷସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଯେ ଅଦୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦୈତବାଦ, ଭେଦବାଦ, ଅଭେଦବାଦ, ଭେଦାଭେଦବାଦ ପ୍ରତ୍ୱତି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦେର ଉଥାନ ଘଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଦର୍ଶନ-ଚିନ୍ତାଯ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁଗେର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ଘଟେ । ବୈଦିକ ଯୁଗେର ଧର୍ମଚିନ୍ତା କାମ୍ୟକର୍ମ ମୋକ୍ଷଦ୍ୟକ ନୟ । ତାଇ ବେଦାନ୍ତର ବ୍ରକ୍ଷଚିନ୍ତା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଚିନ୍ତାଜଗତେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧରା ପଡ଼େ ।

ପାଠ ୨ : ସୃତିଶାସ୍ତ୍ର ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର କର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଏ ଦୂଇ ମାତ୍ରର ସଂଯୋଗ ହାପନ କରେ ସୃତି ହର ସୃତିଶାସ୍ତ୍ର । ଏଥାନେ ଏହେ ଜାନା ଯାଇ ଯୋକ୍ଷଳାତ୍ମେର ଜନ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଉତ୍ତରେଇ ପ୍ରୟୋଜନ ରହେଛେ । ହିନ୍ଦୁଦେଵ ଜୀବନଚର୍ଚାର ଆଶ୍ରମ ବିଜାଗେ ଜାନା ଗେଛେ, ପ୍ରୟୋଗ ପୈଟିଶ ବହର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଚ ଆଶ୍ରମେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂହମ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବହାର ରହେଛେ । ଏହା ପରେର ପୈଟିଶ ବହର ଗାର୍ହଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରମେ ଧର୍ମ ସମ୍ବ୍ରଦ ଅର୍ଦ୍ଧ, କାମ, ଦେବୀ ଆଚରଣୀୟ । ପରେ ବାନଧୂ ଆଶ୍ରମେ ମୁଲିବୃତ୍ତି ଅବଶ୍ୟନ ଏବଂ ଶର୍ମୀଲ ଆଶ୍ରମେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେ ବ୍ରହ୍ମଚିର୍ଭାବ ନିରଜନ । ଏଥାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦୂଇ ଆଶ୍ରମେ କର୍ମଧୋଗ ଏବଂ ଶୈଖର ଦୂଇ ଆଶ୍ରମେ ଜୀବନଧୋଗେର ପରିଚିତ ଘେଲେ । ସୃତିଶାସ୍ତ୍ରେ ହିନ୍ଦୁସମାଜ ପରିଚାଳନାର ବିଧି-ବିଧାନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଚିତ୍ତର କ୍ରମଶ ବିକାଶ ଘଟିବା ଥାକେ ।

ପୌରାଣିକ ମୂଲ୍ୟ

ପୌରାଣିକ ମୂଲ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଚିତ୍ତର ଆଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ କମା ଯାଇ । ଯେତେ ଓ ଉପନିଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଭକ୍ତିଭାବେର ଇଲିତ ରହେଛେ । ଏଟି ପୌରାଣିକ ମୂଲ୍ୟ ଏହେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲାଭ କରେ । ଆର ଭକ୍ତିମାର୍ପିର ଆଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରାଯି ସମାନତନ ଧର୍ମେ ଏକ

କୁଳାନ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହର । ଭକ୍ତିକେ ଅବଶ୍ୟନ କରେ ପରମ ତତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍ସମୀତ ହତ୍ତରାର ଯାତ୍ରାପଥେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀର ସମ୍ପଦାନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ । ଦେବତା ଏକାଧିକ, ତାଇ ପରବର୍ତ୍ତେର ହାନ ନିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀର ଅନୁସାରୀ ଭକ୍ତିଭାବେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଖି ଦେଇ ।



ଏଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପଦାୟର ଉତ୍ତବ ଘଟେ । ଆର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଅବତାର ପୁରାଣରେ ମାହାତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ ଉପପୁରାଣ ପ୍ରଗ୍ରାହିତ ହୁଏ । ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ, ଶିବପୁରାଣ, କୂର୍ମପୁରାଣ, ମଂସ୍ୟପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗପୁରାଣ, ଭାଗବତପୁରାଣ ଏବଂ ବେଶକିଛୁ ଉପ-ପୁରାଣରେ ଏହି ଯୁଗେ ରଚିତ ହୁଏ । ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହିସେବେ ପୂଜିତ ହନ । ଆବାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମତରେ ମତୋ ଆର ଏକଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧର୍ମମତ ହଲେ ଶୈବ ଧର୍ମମତ । ତାଦେର ମତେ ଶିବଇ ସମ୍ମତ ଆଗମଶାସ୍ତ୍ରେର ବଜ୍ଞା ।

ଆବାର ବିଶ୍ୱଚରାଚରେ ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ । ବ୍ରକ୍ଷ ବନ୍ତକେ ସଥିନ ସଂଗ୍ରହ, ସକ୍ରିୟ ବଲେ ଧାରଣା କରା ହୁଏ ତଥନାଇ ତାଁର ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଏସେ ପଡ଼େ; କେନନା ଶକ୍ତିରାଇ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ କ୍ରିୟାତେ । ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନ ଅଭିନ୍ନ । ଯେମନ ଅଗ୍ନି ଓ ତାର ଦାହିକା ଶକ୍ତି । ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା ଅଗ୍ନିର କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ । ଅନୁରପଭାବେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାତୀତ ଶକ୍ତିମାନେର କର୍ମକଳା ଥାକେ ନା । ସୁତରାଂ ଶକ୍ତିଓ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ।

ଏହି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାଙ୍କମତେର ଉତ୍ତବ କରା ହଲୋ, ଏବଂ ମତେର ସବଙ୍ଗଲୋତେଇ ସଂଗ ଈଶ୍ୱର, ଜଗତେର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଭକ୍ତିମାର୍ଗେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସ୍ଥିକାର କରା ହେଁଥେ । ବୈଦିକ କର୍ମବାଦ ଓ ବେଦାନ୍ତେର ନିର୍ଣ୍ଣଗ ବ୍ରକ୍ଷବାଦ ଥିଲେ ପୌରାଣିକ ଧର୍ମମୂଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ଶାନ୍ତରଚନ ଥିଲେ ଜାନା ଯାଏ, ବିଷ୍ଣୁ, ରତ୍ନ, ଶକ୍ତିର ଦେଵୀ-ଏଁରା ସବାଇ ଏକ ମୂଳତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରକାଶ ବା ବିକାଶ - ‘ଏକଂ ସଦ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି’ । ଏକ ବ୍ରକ୍ଷକେଇ ମନୀଷୀରା ବିଭିନ୍ନ ନାମେ ଓ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରେନ । ଧର୍ମଚର୍ଚର ଅବଲମ୍ବନ ହିସେବେ ଭକ୍ତି ସନାତନ ସାଧନାର ଚିନ୍ତାଜଗତେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯେହେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସମ୍ମରଣ କରା ଯାଏ । ଭକ୍ତିପଥେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାର ବିଶେଷ ଆହ୍ଵାନ ଆହେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ । ଏ ଗ୍ରହିତିତେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ସାଧନ ପ୍ରକିଳ୍ୟାଣଲୋର କର୍ମ, ଜାନ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ସମସ୍ତିତ ରହେଛେ । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଉଦାର ଆହ୍ଵାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ସମସ୍ୟ-ଚେତନା ବିବୃତ ହେଁଥେ ।

ଗୀତାର ଭକ୍ତିବାଦେର ପ୍ରକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ଏଥାନେ ଭଗବାନେର ଆହ୍ଵାନ ରହେଛେ - ସତତ ଆମାକେ ସମ୍ମରଣ କର, ଆମାତେ ମନୋନିବେଶ କର । ଆମାର ଭଜନ କର, ଆମାତେଇ ସମ୍ମତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କର, ଏକମାତ୍ର ଆମାରାଇ ଶରଣ ଲାଭ ହିୟାଦି ଉତ୍କିର ମଧ୍ୟ ଦିଲେ ଭଗବନ୍ତକୁ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରା ଯାଏ । ଏହି ଭକ୍ତିର ଧାରାଟି ଆରୋ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ ସମୁଜ୍ଜ୍ଵଳ ହେଁ ଉଠେଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥେ ।

ପାଠ ୩ : ଆଧୁନିକ ଧର୍ମ ସଂକ୍ଷାରେର ଯୁଗ

ଉନିବିଂଶ ଶତକେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ତଥା ବାଂଲାଦେଶେର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଏକ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଚେତନାର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ବିଜ୍ଞାନମନ୍ଦିର ସୁଧୀଜନ ସନାତନ ତଥା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ପ୍ରଚଲିତ ପୂଜା-ପାର୍ବଣ, ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣା ଇତ୍ୟାଦି ନିଯେ ଚିନ୍ତାଭାବନା ଶୁରୁ କରେନ । ତାଁରା ମନେ କରେନ, ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛାଡ଼ା ସାମାଜିକ ଆଚାର-ଆଚରଣେ ଯେ ପ୍ରଚଲିତ ଧର୍ମୀୟ ବିଧି-ବିଧାନ ସେଗୁଳେ ସଂକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୋଜନ ରହେଛେ । ଶାନ୍ତ୍ରେ ବଲା ହେଁଥେ ‘ଯୁକ୍ତିହୀନ ବିଚାରେଣ ଧର୍ମହାନିଃ ପ୍ରଜାୟତେ’-ଯୁକ୍ତିହୀନ ବିଚାରେ ଧର୍ମେର ହାନି ଘଟେ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ସଂକ୍ଷାରକ ମନୀଷୀଦେର ମଧ୍ୟେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାଯେର କଥା ବିଶେଷଭାବେ ସ୍ମରଣୀୟ । ତିନି ଲକ୍ଷ କରେନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀର ଉପାସକ ହେଁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟୀଚିନ୍ତାଯ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ପଡ଼େଛେ । ସବ ଉପାସ୍ୟ ଯେ ଏକଇ ବ୍ରକ୍ଷେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ,

ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦାର୍ଥ ତା ଫୁଲକେ ସମେହେ । ତଥନ ତିନି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମେର ଉପାସନାର ତମ୍ଭକେ ଉପହାସିତ କରେନ । ଏତାବେ ତିନି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବଳଧୀମେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଜନ୍ୟ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମକେ ସାଧନାର ଆହାନ ଜୀବାଳେନ । ହାଣି କରିଲେନ ‘ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ’ । ତିନି ବଳଲେନ ବ୍ରାହ୍ମଇ ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ । ହିନ୍ଦୁଯା ଏକେବିବାଦୀ ।

ତୋର ଏହି ସଂକାର-ଚେତନା ସ୍ଵର୍ଗହଲେ ନନ୍ଦିତ ହଲେଓ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ତାମେର ପ୍ରଚାରିତ ବିଶ୍වାସ ଓ ଶୁଣ୍ଟା-ପାର୍ବତ ତ୍ୟାଗ କରାତେ ପାରେନି । ଏଦେର ଅମୃତାଭିତ୍ତିତେ ଶତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲେହେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃତ୍ତବେର ସାକାର ମାତୃସାଧନାର ସାକଳ୍ୟର ଜାରୀ । ଏକଥେବାଦୀ ଧାରଣା ଆର ବହୁ ଦେବ-ଦେଵୀଙ୍କୁଟେ ବିଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଏ ଦୁଇଯେର ସମସ୍ୟା ସାଧିତ ହେଲା ଠାକୁର ରାମକୃତ୍ତବେର ଅମର ଉପଦେଶେ – ‘ଯତ ଯତ, ତତ ପଦ’; ‘ଯତ ଜୀବ, ତତ ଶିବ’ ଇତ୍ୟାଦି ବାରୀର ମାଧ୍ୟମେ ।



ଠାକୁର ରାମକୃତ୍ତବେର ଭାବାଦର୍ଶଗୁଣୀ ପ୍ରଚାରେର ଉପଦେଶେ ୧୮୮୬ ମାର୍ଗେ ରାମକୃତ୍ତ ଯଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଏମଗେ ୧୮୯୭ ମାର୍ଗେ ଶାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କର୍ତ୍ତକ ରାମକୃତ୍ତ ମିଶନ ହାସିତ ହେଲା । ଏହି ରାମକୃତ୍ତ ଯଠ ଓ ରାମକୃତ୍ତ ମିଶନ ନାମେ ଯୁଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱବାଦୀ ରାମକୃତ୍ତ ଭାବାଦୋଲନ ବା ବେଦାତ ଆଦୋଲନ ସକ୍ରିୟାଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଇଛି । ଶାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦେର ବାଦୀ ‘ବିବାଦ ନର, ସହାଯତା; ବିନାଳ ନର, ପରମପାତ୍ରେର ଭାବ ଏହିଥିରେ ଯତିବିରୋଧ ନର, ସମସ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି’ । ଏହି ଆଦର୍ଶଟି ଖୁବ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରେକ୍ଷାପତ୍ର ନର, ଏହି ବିଶ୍ୱ ମାନୁଷଭାବ କ୍ଷେତ୍ରେ ସମାନଭାବେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ।

ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ୧୮୧୨ ଖ୍ରୀଜେ ଆବିର୍ଜ୍ଞ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେ ସକଳ ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନୁଷକେ ଏକ ହରିନାମେ ମେତେ ଥାକାର ଆହାନ ଜୀବାଳ । ତୋର ଏହି ସମ୍ମନିତି ଧେକେଇ ଶତ୍ରୁଯା ଧର୍ମର ଉତ୍ତବ । ଏ ଧର୍ମର ମୂଳମୂର୍ତ୍ତି ହଜେ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ବିଶେଷ ହରିନାମେ ମେତେ ଥାକା । ହରିନାମେ ଜୀବାଳ କଲ୍ୟାଣ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାତେ ସମର୍ଥ ।

ଏଥାନେ ଉତ୍ତ୍ରେଣ୍ଟ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବିକାଶରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ୟ ଯହାପ୍ରତ୍ୟୁଷ (ପରମପାତ୍ର ଶତକ) ପ୍ରେମଭାବିତ ଧର୍ମ ତଥା ଆଦୋଲନଟି ବିଶ୍ୱର ଅବଦାନ ରାଖାନ୍ତର ସମର୍ଥ ହେଲା । ଚିତ୍ତନ୍ୟ ମହାପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରେମଭାବିତ ଆଦୋଲନଟି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀର ଅନୁସାରୀଦେର ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣଦେ ଅର୍ଥ ଦୂର କରାତେ ଅନେକବାନି ସମର୍ଥ ହେଲା । ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦିଲେଇ ଶରୀର ଆବାଶ୍ୟକ ଉପବାନକେ ଶାନ୍ତ କରା ଯାଇ । ଆର ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅବ୍ରାହମ, ନାରୀ, ପୁରୁଷ ସକଳେର ସମାନ ଅଧିକାର ବରେହେ । ଚିତ୍ତନ୍ୟ ଯହାପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏହି ପ୍ରେମଭାବିତ ଅନୁସରଣ କରେ ଆବିର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଏହୁ ଅନେକରୁ ସୁନ୍ଦରେଇ । ତିନି ଚିତ୍ତନ୍ୟ ଯହାପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରେମଭାବିତ ପରେର ସାଧକ ହେଲେ ଧର୍ମ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅବଦାନ ରେଖେ । ତୋର ଏହି ଆଦର୍ଶକେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୋର ପରମ ଭକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଜୀ ଯହାନାମ ସମ୍ପଦାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ ଆର ଏହି ସମ୍ପଦାରେ ଗୌରବୋଜୁଳ ନକ୍ଷତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଜେଇ ଡ. ଯହାନାମବ୍ରାତ ବ୍ରାହ୍ମଚାରୀ । ତୋର ସୁଗଣୀର ପାଞ୍ଜିତ୍ୟ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିତେ କୃକ-ଗୌର-ବକ୍ର ଶୀଳା ଯାଦ୍ୱିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ । ଯହାନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜୀବର ଉତ୍ସାହରେ ଉପକରଣ ।

ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ୟ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ଧର୍ମଟି ବିଶେର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶେ ପ୍ରଚାର କରାର ମାନସେ ୧୯୬୬ ସାଲେ ଜୁଲାଇ ମାସେ ନିଉଇୟର୍କ ଶହରେ ଶ୍ରୀ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଞ୍ଜର୍ଜାତିକ କୃକ୍ଷଭାବନାୟତ ସଂସ୍ଥ 'ଇସକନ' (ISKCON) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ତିନି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରିପୋଷକ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ, ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ୟ ଚରିତାୟତ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମଗ୍ରହେର ଇଂରେଜି ଭାର୍ମନ ପ୍ରକାଶ କରେନ ।



ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନେର ଅନୁସାରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୟାଜ ଜୀବନ ଥେକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ ଦୂର କରତେ ସଚେଟ ହନ । ତାଁର ଅନୁଶୀଳିତ 'ହରେ କୃଷ୍ଣ' ମହାମତ୍ତ୍ଵ କାର୍ତ୍ତମ ଜୀବେର ମୁଦ୍ରାଙ୍କରଣ ଅବଶ୍ୟକ ହେଁ ଜଗତେ ନାମ ମାହାତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛେ ।

ଠାକୁର ଅନୁକୃତଚନ୍ଦ୍ର ୧୮୮୮ ସାଲେ ପାବନା ଜ୍ଞେଲାର ହିମାଇତପୁର ଗ୍ରାମେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ତିନି 'ସଂସକ୍ରମ' ନାମେ ଏକଟି ଧର୍ମୀୟ ସଂଗ୍ଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ସଂସକ୍ରମ ଆଦର୍ଶ ହେଁ - ଧର୍ମ କୋନୋ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ନୟ ବରଂ ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ଜୀବନସ୍ତ୍ର । ଭାଲୋବାସାଇ ମହାମୂଳ୍ୟ ସା ଦିଯେ ଶାନ୍ତି କେନା ଯାଏ । ଏ ସଂଘେର ପ୍ରାଚିତି ମୂଳନୀତି ହେଁ-ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୂତି, ସନ୍ତ୍ୟଗନୀ ଓ ସଦାଚାର । ଆର ଏ ସଂଘେର ମୂଳ ଶ୍ରଦ୍ଧ ହିସେବେ ଶିକ୍ଷା, କୃବି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସୁବିବାହ ନୀତିଶଳୀ ଅନୁଶୀଳିତ ହେଁ । ଏମନିଭାବେ ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନକେ ଏକତ୍ରିତ କରେ ଜୀବନ ଗଠନଇ ସଂସକ୍ରମଦେର ଆଦର୍ଶ । ତାଁର ଛଡା, କବିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ ଏଣ୍ଡେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେଛେ । ସଂସକ୍ରମ ଚାହୁଁ ଆଦର୍ଶ ମାନ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ, ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମଯାଜକ । ତାଁର ଦୃଷ୍ଟିଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯ ନନ୍ଦିତ ହେଁ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିକାଶେର ଭାବେ ଭାବେ ଯେ ନତୁନ ନତୁନ ଧର୍ମଚର୍ଚାର ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଁ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳୀର ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ । ଏହିର ସଂଗ୍ରହନାମ ନାମ 'ଆୟାଚକ ଆଶ୍ରମ' । ଏହି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵର୍ଗପାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ୧୮୯୩ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ବାହାଦୁରେର ଚାନ୍ଦପୁର ଶହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ । ଆୟାଚକ ଆଶ୍ରମର ନାମଟିର ମଧ୍ୟେଇ ଏହି ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ନିକଟ ହତେ ଅର୍ଥ ଯାଚଣା ନା କରା ଏ

সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অ্যাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মাচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা। স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। এর মূল আবেদন ‘আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব’। স্বামী স্বরূপানন্দ রচিত বহু গ্রন্থ, সংগীত সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনাদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। সকলের তরে সকলে আমরা – এ ছিল তাঁর কল্যাণময় জীবনভাবনা।

স্বামী প্রণবানন্দের (১৮৯৬-১৯৪১) সেবাদর্শ হিন্দু সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করছে। ১৯২১ সালে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে দূর করে সমাজে এক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। জনগণের সেবা করার জন্য তিনি ‘ভারত সেবাশ্রম সংঘ’ নামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরও লোকসেবা বা লোকশিক্ষার জন্য সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তাঁর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। তিনি প্রচলিত অর্থে গুরগিরি করেননি। কিন্তু পালন করেছেন একজন লোকশিক্ষকের ভূমিকা। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে গুরই বিবেচনা করতেন। বাংলাদেশ এবং ভারতসহ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাবা লোকনাথকে কেন্দ্র করে বারদীর লোকনাথ মন্দিরের পরিচালনা পরিষদ, ঢাকার স্বামীবাগে প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ মন্দিরকেন্দ্রিক লোকনাথ সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ রকম আরও ধর্মীয় সংগঠন হিন্দুধর্মের প্রচার ও বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান মেলে। তবে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহামিলন সূত্র লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্ম সংস্কারপথী হয়েও সন্তান ভাবধারা সংরক্ষণ করে চলছে। মানব জীবনের ব্যবহারিক সমৃদ্ধিসহ আধ্যাত্মিক জীবনের পরম কল্যাণ লাভ হিন্দু ধর্মের মৌলিক স্তুপ। এটি যুগ পরিক্রমার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক অনন্য ভাবেরই দ্যোতনা বহন করছে। হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য চেতনা উপলক্ষ্মি করে হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ গৌরব বোধ করে থাকেন।

নতুন শব্দ- সিদ্ধুসভ্যতা, জ্ঞানকাণ্ড, সন্ন্যাস ধর্ম, ব্রহ্মসূত্র, শাক্ত, সমন্বয়, একেশ্বরবাদ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧। ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର କ୍ରମବିକାଶକେ କୟାଟି ସ୍ତରେ ବିଭକ୍ତ କରା ହେଁଛେ?

- | | |
|----------|----------|
| କ. ଏକଟି | ଖ. ଦୁଟି |
| ଗ. ତିନଟି | ଘ. ଚାରଟି |

୨। କୋଣ ମହାପୁରୁଷର ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରେ ବାଙ୍ଗାଳି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଚେତନାର ଆକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦ୍ଦ୍ରୁ ସୁନ୍ଦରେର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ?

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| କ. ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର | ଖ. ଡ. ମହାନାମବ୍ରତ ବ୍ରନ୍ଦାଚାରୀ |
| ଗ. ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ | ଘ. ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର |

୩। ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ବଳତେ ବୋବାଯାଇ -

- i. ଜାଗତିକ ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର କ୍ରମବିକାଶ
- ii. ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟୋଗେର ସମସ୍ୟା
- iii. କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନେର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- | | |
|--------|------------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଗ. iii | ଘ. i ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ନୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖ୍ୟାର୍ଜୀ ଏକଜନ ଉଦ୍‌ଦୀର୍ଘ ମନେର ମାନୁଷ । ତିନି ତା'ର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀତେ ଅଷ୍ଟପଦ୍ମର ନାମସଙ୍ଗେର ଆୟୋଜନ କରେନ । ସେଥାନେ ତା'ର ଗ୍ରାମେ ଉଚ୍ଚ-ନିଚୁ, ଧନୀ-ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳକେ ଆମନ୍ତରଣ ଜାନାନ । ତାର ବାଢ଼ିତେ ସକଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ମେତେ ଓଠେନ ।

୪। ଉଦ୍ଦିପକେର ନୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଚରିତ୍ରେ ତୋମାର ପଠିତ କୋଣ ମହାପୁରୁଷର ଆଦର୍ଶ ଫୁଟେ ଉଠେଛେ?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| କ. ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵରପାନନ୍ଦ | ଖ. ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର |
| ଗ. ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର | ଘ. ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟଦେବ |

୫। ଉତ୍ତ ମହାପୁରୁଷର ମତାଦର୍ଶ ଥେକେ ଉତ୍ତର ହେଁଛେ -

- | | |
|----------------|------------------|
| କ. ଭକ୍ତିବାଦ | ଖ. ମତୁଯାବାଦ |
| ଗ. ଅୟାଚକ ଆଶ୍ରମ | ଘ. ସଂସଙ୍ଗ ସଂଗ୍ଠନ |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শংকর বেশ কিছুদিন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোনো চাকুরি যোগাড় করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তার ছেটবেলার বন্ধু দুর্জয় শংকরকে একটি আশ্রমে নিয়ে যায়। এ আশ্রমে কারো কাছ থেকে কোনো চাঁদা বা সাহায্য নেওয়া হয় না। এরা নিজেদের অর্থের সংস্থান নিজেরাই করে। শংকর এ আশ্রমের শিক্ষায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে।

ক. অবতারবাদ কী?

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. শংকর কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়? তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শের শিক্ষা মূল্যায়ন কর।

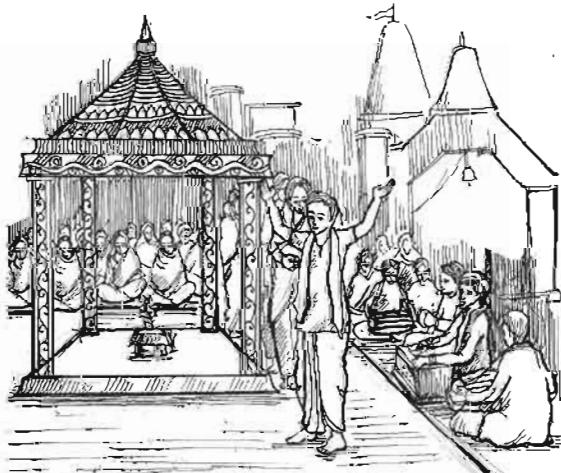
তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার-আচরণ চার্চিত হয় তা-ই ধর্মাচার। এগুলো সোকাচারও বটে। এসকল আচরণে মাজিক কর্মের নির্দেশ আছে। অপরদিকে ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যক্তিত ধর্মানুষ্ঠান হয় না আবার ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষেপে উৎসব, গৃহপ্রবেশ, জামাইষ্টী, গ্রামীণকল্পন, ভাইকোটা, দীপালি, হাতেখড়ি, নবাব প্রভৃতি ধর্মাচারগুলোর পাশাপাশি দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোও আমাদের সংস্কৃতি।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচারের ধারণা দুইটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা আচারের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- প্রধান প্রধান ধর্মাচারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মাচারের শুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও নামযজ্ঞের বর্ণনা এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ধর্মাচারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- তীর্থ দর্শনের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- গণাভীর্ষের পরিচয় ও শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।



পাঠ ১ : ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সামা বছর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে। কথায় বলে, বার মাসে তের পার্বণ। এর মধ্যে কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান। আর কিছু আছে লোকাচার। মূলত জীবনটাকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় করে রাখার চেষ্টা থাকে সতত। যে-সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুস্নদ ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে, তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত। এগুলোকে সোকাচারও বলে। তবে এর মধ্যে থাকে মাজলিক কর্মের নির্দেশ। আবার ধর্মশাস্ত্রে পূজাসহ নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে। এগুলো ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার করতে হবে। সংক্ষেপি, বর্ষবরণ, দোষযাত্রা, রথযাত্রা উৎসবসহ এখানে করেকৃতি ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-আচারের সম্পর্ক

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-সমস্ত মাজলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার। অপরদিকে ইশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তা-ই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-পার্বণ পরম্পরার সম্পর্কিত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত। আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু পূজার সঙ্গে মিশে আছে নানারকম ধর্মাচার। ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচারও পালন করতে হয়।

পাঠ ২ ও ৩ : কতিপয় ধর্মাচার

সংক্ষেপি

বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্ষেপি। এ দিনে ঝুঁতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্ষেপি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষ সংক্ষেপি ও চৈত্র সংক্ষেপির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপি শব্দটি কোথাও কোথাও ‘সাকরাইন’ নামে পরিচিত। তবে পৌষপার্বণ বা পৌষ সংক্ষেপিকে মকর সংক্ষেপিও বলা হয়। হিন্দুরা এই দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে।

চৈত্র সংক্ষেপির প্রধান উৎসব শিব পূজা। এর অপর নাম নীল পূজা। শিবের পূজা করা হয়। অনেক স্থানে একে বৃক্ষশিবও বলে। শিব পূজার একটি অঙ্গ চড়ক পূজা। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে মান, দান, ব্রত, উপবাস, ধ্যান মহলজনক উৎসব করা হয়।

গৃহপূর্বেশ

নবনির্মিত গৃহে প্রথম পূর্বেশ করার সময় মাজলিক অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাঞ্ছ বা ভূমিদেবতা এবং গৃহপতির অভিষ্ঠ দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয়।

জামাইষ্টী

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষ্টী অনুষ্ঠিত হয়। খুবই আনন্দময় অনুষ্ঠান এটি। এদিন জামাইকে শুভরবাড়িতে নিমজ্জন করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ



ଆଯୋଜନ କରା ହୁଏ । ଜାମାଇକେ ନତୁନ କାପଡ଼-ଜାମା ଦେଓଯା ହୁଏ । ଜାମାଇଓ ଶାନ୍ତିଜୀବିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜୀଯକେ ସାଧ୍ୟମତୋ ନତୁନ କାପଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଦିନ ସତୀପୂଜାଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହୁଏ । ସନ୍ତାନ କାମନାଯ ଓ ସନ୍ତାନେର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସତୀଦେବୀର ପୂଜା ହୁଏ ।

ରାଖୀବକ୍ଷନ

'ରାଖୀ' କଥାଟି ରକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଉଥିରେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଚାରେର ମଧ୍ୟେ ରାଖୀବକ୍ଷନ ଅନ୍ୟତମ । ଏଦିନ ବୋନେରୀ ତାଦେର ଭାଇଦେର ହାତେ ରାଖୀ ନାମେ ଏକଟି ପରିତ ସୁତୋ ବେଁଧେ ଦେଯ । ଭାଇ-ବୋନେର ମଧ୍ୟକାର ଆଜୀବନ ଭାଲୋବାସାର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରେ ଏହି ରାଖୀବକ୍ଷନ । ନିଜେର ଭାଇ ଛାଡ଼ାଓ ଆଜୀଯ ଓ ଅନାଜୀଯ ଭାଇଦେର ହାତେଓ ରାଖୀ ପରାନୋ ହୁଏ ଏବଂ ଏତେ ଭାଇ-ବୋନେର ମଧ୍ୟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଛାପିତ ହୁଏ । ଶ୍ରାବଣ ମାସେର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିତେ ଏ ପର୍ବତୀ ପାଲନ କରା ହୁଏ ବିଧାୟ ଏ ଦିନଟି ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ନାମେଓ ପରିଚିତ ।

ଆତ୍ମଦିତୀୟା

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେର ଶୁକ୍ଳା ଦିତୀୟା ତିଥିତେ ଏ ଉଥିରେ ପାଲନ କରା ହୁଏ । ଏ ଦିନଟି ବଡ଼ଇ ପରିତ । ପୁରାଣେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ-
କାର୍ତ୍ତିକର ଶୁକ୍ଳା ଦିତୀୟା ତିଥିତେ ଯମନାଦେବୀ ତାଁର ଭାଇ ଯମେର ମଙ୍ଗଳ କାମନାଯ ପୂଜା କରେନ । ତାଁରଇ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭାବେ ଯମଦେବ ଅମରତ୍ମ ଲୋଭ କରେନ । ଏ କଳ୍ୟାଣତ୍ତ୍ଵରେ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେର ବୋନେରୀଓ ଏ ଦିନଟି ପାଲନ କରେ ଆସିଛେ ।

ଭାଇକେ ଥାତେ କୋନୋ ବିପଦ-ଆପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରତେ ନା ପାରେ ସେଜନ୍ୟ ବୋନେର ସତତ କାମନା । ଏଦିନ
ଉପବାସ ଥିଲେ ଭାଇଯେର କପାଳେ ଫୋଟା ଦେଓଯା
ହୁଏ । ବଁ ହାତେର କଡ଼େ ଅଥବା ଅନାମିକା ଆତ୍ମଲ
ଦିନେ ଚନ୍ଦନେର (ଘି, କାଜଳ ବା ଦଧିଓ ହତେ
ପାରେ) ଫୋଟା ଦିଯେ ଭାଇଯେର ଦୀର୍ଘଯୁ କାମନା
କରେ ବଢା ହୁଏ-

‘ଭାଇଯେର କପାଳେ ଦିଲାମ ଫୋଟା,
ଯମେର ଦୂମାରେ ପଡ଼ିଲ କଟା ।’

ଏଜନ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ଏକ ନାମ ‘ଭାଇଫୋଟା’ ।
ଭାଇକେ ଫଳ, ମିଟି, ପାରେସ, ଲୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦେଇ
ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶନ କରା ହୁଏ । ଶୁଦ୍ଧ ପାରିବାରିକ ଗତିର
ମଧ୍ୟେଇ ନାହିଁ, ଏ ଉଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଜାତିଧର୍ମ
ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମଦ୍ୱାରା ଜାହାତ କରେ
ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଗଡ଼େ ତୋଳା ସମ୍ଭବ ।



বর্ষবরণ

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেঁয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিটি খাওয়া, ভাব বিনিয়ন ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।



দীপাবলি

শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অঙ্ককার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অঙ্গনতার মোহাফকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আওনে পৃষ্ঠায়ে জ্বানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক – এ ব্রত নিরেই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপাবলিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুষ্ণিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

হাতেখড়ি

সরস্বতী পূজার দিন শিখদের শিক্ষা-জীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় শুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিখরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

নবান্ন

নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অর্থহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রুকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাজলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি খতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

একক কাজ : প্রত্যেকটি বিষয়	সংক্রান্তি	ভাত্তবিত্তীয়া	দীপাবলি	হাতেখড়ি	নবান্ন
সম্পর্কে দুষ্টি করে বাক্য শেখ					

পাঠ ৪ : ধর্মানুষ্ঠান

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোলপূর্ণিমা) দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুসুমে রাত্তিরে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরম্পর পরম্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্ধাং ফাল্গুনী শুক্র চতুর্দশীর দিন ‘রুড়ির ঘর’ বা ‘মেঢ়া’ পুড়িয়ে অঘজলকে দূর করার বা ধৰণে করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেকস্থানে এসময় সময়ের বলা হয়- ‘আজ আমাদের মেঢ়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।’

এটি মূলত বৈক্ষণীক উৎসব। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেঠেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত-উৎসবও বলা যায়।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই শক্র-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মন্ত হয়ে বিভেদ ভুলে থায়। সকলেই হয়ে যায় একাজ্ঞ। এটাই দোলযাত্রার সার্বজনীনতা। বাংলার বাইরে এটি হোলি উৎসব নামে পরিচিত।

রথযাত্রা

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বৃপ্লান্ত করেছে।

আবাঢ় মাসের শুক্র-বিত্তীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। এই রথযাত্রা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামেই পরিচিত উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা - জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। তত্ত্বগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রাশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্ধাং একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্লোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই রথযাত্রা পালিত হয়। তবে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব বাংলাদেশে বিখ্যাত।



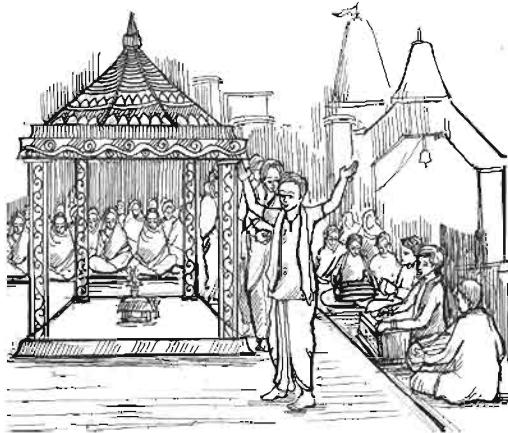
রথযাত্রার ভাংগৰ্হ :

রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভিন্ন থাকে না। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক শুরুত্ব রয়েছে।

পাঠ : ৫ : ধর্মানুষ্ঠান ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের শুরুত্ব

নামযজ্ঞ

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃকুলাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিষিদ্ধে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘন্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে- শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যত্নগা থেকে পরিআশ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।



এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভূলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

একক কাজ : তোমার এলাকায় অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা অথবা রথযাত্রা অথবা নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

পারিবারিক-সামাজিক জীবনে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের শুরুত্ব

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মচারের শুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, ন্যূ ও বিশ্বাসী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মচার তেমন ক্ষমপ্রসূ হয় না। ধর্মচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায় আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুন্দর-সুস্থুভাবে পরিচালনা করতে হলে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচারের নীতি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশের তীর্থস্থান

বাংলাদেশে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মহেশখালীর আদিনাথের মন্দির, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি, নারায়ণগঞ্জের লালভবন্দ, নোয়াখালীর রামঠাকুরের সমাধিস্থল, পাবনার হিমাইতপুর, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের পণাতীর্থ, শ্রীহট্টের মুগলটিলা প্রভৃতি।

তীর্থদর্শনের ক্ষমতা

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্জন স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুন্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দৃঢ়ব দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাঢ়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্মৃতি। মহাপুরুষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উৎসুক করে।

পণ্টাতীর্থ এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে পণ্টাতীর্থস্থানটি অবস্থিত। পণ্টাতীর্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্বদ শ্রীমৎ অবৈত প্রভুর জন্মস্থান। এটি লাউড়ি পাহাড়ে অবস্থিত। চৈত্রমাসে বারষীয়ানে এখানে বহু মানুষের সমাবেশ হয়। সাধক পুরুষ অবৈত প্রভুর মা লাভাদেবীর গঙ্গায়ানের খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু শারীরিক অসাধ্যের কারণে তিনি গঙ্গায়ানে যেতে পারেননি। অবৈত প্রভু তাঁর মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য যোগসাধনাবলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজ্ঞল এক নদীর মধ্যে নিয়ে আসেন।

এই জলধারাটিই পুরনো রেণুকা নদী। বর্তমানে এটি যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানার এই নদীর তীরে পণ্টাতীর্থে প্রতি বছর বারষীয়ানে বহু লোকের সমাগম হয়।



একক কাজ : পণ্টাতীর্থের মতো তোমার দেখা কোনো তীর্থস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

বহননির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'নবান্ন' উৎসবে কোন দেবীর পূজা করা হয়?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. সরুবতী | খ. লক্ষ্মী |
| গ. দুর্গা | ঘ. মনসা |

২। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব কোনটি?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. আমাইষষ্ঠী | খ. দোলযাত্রা |
| গ. দীপাবলি | ঘ. শিবপূজা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্র অয়ন পহেলা বৈশাখের সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল মহামিলন মেলা।

৩। অয়ন গ্রামে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. সংক্রান্তি | খ. গৃহপ্রবেশ |
| গ. বর্ষবরণ | ঘ. নবান্ন |

৪। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উক্ত অনুষ্ঠানটি অয়নের জীবনে এক মহামিলন মেলা।
কারণ এ অনুষ্ঠানটি-

- i. সর্বজনীন
- ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার মিলন
- iii. ধর্মীয় ও নেতৃত্ব শিক্ষা সম্পর্কিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কনক উপবাস থেকে তার ভাই সৌবর্ণের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। তার বিশ্বাস সৌবর্ণ সকল বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাবে।

- ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়?
- খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়?
- গ. কনক কীভাবে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদযাপন করছে, তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে কনকের পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

২। চৈত্র মাসে গোবিন্দ তার মা-বাবার সাথে লাঙলবন্দ ম্লানে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে তার মা-বাবার সাথে ম্লান সম্পন্ন করে। ম্লান শেষে হাজার মানুষের ভিড়ে লাঙলবন্দ ম্লান সম্পর্কে তার কৌতূহল জাগে এবং সে লাঙলবন্দ ম্লানের উৎপত্তি, বিকাশ ও মহাপুরুষের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

- ক. পুণ্যস্থান কী?
- খ. ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান ভ্রমণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- গ. গোবিন্দের তীর্থ দর্শনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে তীর্থস্থানের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তীর্থ ভ্রমণে মানুষের জীবনে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুধর্মে সংক্ষার

আমাদের এই পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মাজলিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করেছেন ‘মনুসংহিতা’, ‘যাজ্ঞবঙ্গসংহিতা’, ‘পরাশরসংহিতা’ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলো হিন্দু ধর্মের বিধিবিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানকে আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাজলিক ক্রিয়া। মৃতজনের উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারালোকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধি-বিধানও হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত রয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মীয় সংক্ষারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বিভিন্ন সংক্ষারের নাম উল্লেখ করতে পারব এবং প্রচলিত সংক্ষারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় সংক্ষারের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব
- বিবাহের একটি ঘন্টের সরলার্থ এবং ঘন্টের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ‘হিন্দুবিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারম্পরাগিক সুদৃঢ় ধর্মীয় বঙ্গন’- বিশ্লেষণ করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিবাহের শুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ‘পশ্চিমা অধর্ম’ এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শবদেহ প্রদক্ষিণ করার সময়স্থান মন্ত্রটি সরলার্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- অশৌচের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অশৌচ পালনের পদ্ধতি এবং শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শ্রাদ্ধের ধারণা ও আদ্যশ্রাদ্ধের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের শুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মীয় সংক্রান্তের ধারণা ও ধরন

ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্রজীবনে যে-সকল মাজলি অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংক্রান্ত। সৃষ্টিশান্ত দশবিধি সংক্রান্তের উল্লেখ আছে। যেমন- ১. গর্ভাধান ২. পূজ্যবন ৩. শীঘ্ৰজোন্মুদ্রণ ৪. জ্ঞাতকর্ম ৫. নামকরণ ৬. অন্ত্রাশন ৭. চূড়াকরণ ৮. সমাবর্তন ৯. উপনয়ন ১০. বিবাহ।

এখানে প্রচলিত কয়েকটি সংক্রান্তের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

জ্ঞাতকর্ম : জন্মের পর পিতা বর, বাতিমৃৎ ও মৃত্যুবারা সভানের জিহ্বা স্পর্শ করে যাজ্ঞোচারণ করেন একে বলে জ্ঞাতকর্ম।

নামকরণ : সভান জুমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিবসে নামকরণ করবীর।

অন্ত্রাশন : পুত্রের বংশ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজ্যাদি মাজলি অনুষ্ঠানের যাত্যয়ে ধৰ্ময় অন্ত্রাশনের নাম অন্ত্রাশন।

সমাবর্তন : পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিছু পুরুষ থেকে নিজগৃহে কিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকমহাশয় বা কর্তৃ শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।



বিবাহ : মৌবলে বেদ ও পিতৃগুণা, হোম প্রত্যক্ষ যাত্যয়ে যাজ্ঞোচারণপূর্বক বর ও বধুর মি঳নক্রম সংক্রান্তকে বলা হয় বিবাহ। দশবিধি সংক্রান্তের মধ্যে বর্তমানে গর্ভাধান, পূজ্যবন, শীঘ্ৰজোন্মুদ্রণ অনুষ্ঠি সংক্রান্ত সূচিগুরু।

পাঠ ২ : বিবাহ

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চৰ্তা। তীব্র হজেন পুরুষের সহ্যমিশ্রী। তীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধৰ্মকার্যই সম্পৰ্ক হয় না। ‘বিবাহ’ শব্দটি বি-পূর্বক বহু ধাতৃ ও অঞ্চল প্রত্যয়বোঝে গঠিত। বহু ধাতৃয় অর্থ ‘বহন করা’ এবং বি উপসর্গের অর্থ বিশেষজ্ঞতা। সুকরাং ‘বিবাহ’ শব্দের অর্থ বিশেষজ্ঞতা ভাববহন করা। বিবাহের অঙ্গে পুরুষকে জীব ভৱণ-পোষণ এবং মানসম্মত গৃহার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

বিবাহের ধৰ্কারভেদ

স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট ধৰ্কার বিবাহের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গার্জৰ্ব, রাক্ষস এবং গৈগাচ। এই আট ধৰ্কার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ বিবাহ প্রচলিত। কন্যাকে বন্ধু দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিষ্ণান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যা দান করাকে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ বিবাহ।

সমাজে গার্জৰ্ব বিবাহেরও প্রচলন আছে। নারী-পুরুষ পরম্পর শপথ করে মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তার নাম গার্জৰ্ব বিবাহ। মহাভারতে দুশ্মন ও শকুন্তলার বিবাহ গার্জৰ্ব বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘৰ্ত্তা

‘বদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।’
(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

“তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।” এই মঞ্জের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠে গভীর একাত্মার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে পাঁঢ়া। আমৃত্যু তারা সুখে-দুঃখে একসাথে ধোকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

বিবাহের শুরুত্ব

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে বে-দশটি সংস্কার বা মাজলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের



জনক হয়ে শাশ্঵ত করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে শাশ্বত করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে উঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে শ্রেমঙ্গীতি, মেহ, বাস্ত্রসল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিশূলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে উঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার।

পাঠ ৩ ও ৪ : বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ

৩ হিন্দু বিবাহের কিছু বিধিবিধান শাস্ত্রীয়, কিছু অনুষ্ঠান স্তৰ্ণী-আচার। হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, জীবনের
৪ সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। উভয়ে নারায়ণ, অম্বিনি, শুক্র, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে

সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধবনি ও শঙ্খধবনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাঙ্গ হয় যজ্ঞ এবং কতগুলো লোকাচারের মাধ্যমে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন- আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশান্ত, গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিথিতে বিবাহ চিহ্ন, সন্তুষ্টিগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অথঙ্গভেদে লোকাচার।

বৃদ্ধিশান্ত

বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয় কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রদ্ধার্তর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশান্ত।

গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা)

গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়ো ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটো নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

এটি মূলত দেহশুন্দরিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুস্কা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পত্তির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অঙ্গনিহিত উদ্দেশ্য।

একক কাজ : বিবাহের আগে বৃদ্ধিশান্ত ও গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা হয় কেন? কারণ উল্লেখ কর।

মালাবদল

বর তার গলার মালাটি কনের গলায় এবং একইভাবে কনেও তার গলার মালাটি বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় পর পর তিনবার পরম্পরের মালা বদল করা হয়।

সম্প্রদান

বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে।

যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উপরমুখী হয়ে বসেন।

পুত্রলি অঙ্গিত, আশ্রমপ্লাবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা



পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধবনি, শঙ্খধবনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্ধে, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। অনেক স্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিঁটও দেওয়া হয়।

একক কাজ : বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মৌকিকতা ব্যাখ্যা কর।

সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন

সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকেই কন্যা অর্থাৎ স্তৰী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

পণপ্রথা অধর্ম

কন্যাকে পাত্রস্ত করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতাত্ত্বিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাস্তায়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জগন্য অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা এগিয়ে আসব। এ জগন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

একক কাজ : সিঁথিতে সিঁদুর পরানো একজন হিন্দু রমণীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৫ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

১ ‘অন্ত্য’ ও ‘ইষ্ট’ এই দুটি শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। ‘অন্ত্য’ শব্দের অর্থ শেষ এবং ‘ইষ্ট’ শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ ‘শেষযজ্ঞ’ অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া।

মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অস্তিত্ব হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এই সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শুশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডান করতে হয়।

এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। চন্দনকাঠ পাওয়া না গেলে ক্ষতি নেই। যেখানে যেমন কাঠ প্রাপ্য তা দিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও শবদাহ করা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র

সাধারণত নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র শির বা মন্তকে অগ্নিপ্রদান করে। তার অভাবে কে অগ্নিপ্রদান করবে, তার একটি ক্রমধারা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রচলিত কথায় বলা হয় মুখাগ্নি।

অগ্নিদানের পূর্বে শবদেহ সাত বা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে করতে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয় :

‘ওঁ কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা ।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥
ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্ ।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান् লোকান् স গচ্ছতু ॥’

অর্থাৎ জেনে বা না জেনে তিনি হয়ত দুষ্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। ধর্ম, অধর্ম, লোভ ও মোহাচ্ছন্ন তাঁর শরীর দঙ্গ করুন। তিনি দিব্যলোকে গমন করুন।

দাহকার্য শেষ হলে চিতায় জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করতে হবে। শূশানবন্ধুগণ বা দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে স্নান করে পরিষ্কার হবেন।

একক কাজ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটির অর্থ লেখ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুত্ব

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সংঘার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই শুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ । କେଉଁ ମାରା ଗେଲେ ପାଡ଼ା-ପ୍ରତିବେଶୀ, ଆତୀୟ-ସଜନ ଦେଖତେ ଆସେନ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର, ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ତାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ । ଏତେ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନେର ବନ୍ଧନ ଆରା ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ତାହାଡ଼ା ଅନ୍ୟେଟିକ୍ରିୟାର ମନ୍ତ୍ରାଳୀ ଉଚ୍ଚାରଣେର ଫଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ । ସକଳେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ସୌହାର୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ତୈରି ହୁଏ । ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସାମାଜିକ ମୂଳ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ପାଠ ୬ : ଅଶୌଚ

‘ଶୌଚ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ‘ଶୁଚିତା’ । ସୁତରାଂ ‘ଅଶୌଚ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଚିତା ବା ପବିତ୍ରତାର ଅଭାବ । ମାତା-ପିତା ବା ଜ୍ଞାତିବର୍ଗେର ମୃତ୍ୟୁତେ ଆମାଦେର ଅଶୌଚ ହୁଏ । କାରଣ ପ୍ରିୟଜନେର ମୃତ୍ୟୁତେ ଆମାଦେର ମନ ଶୋକେ ଆଚଛନ୍ତି ହୁଏ । ଆମାଦେର ଚିନ୍ତା ସାଧନ- ଭଜନେର ଉପଯୋଗୀ ଥାକେ ନା । ତଥାନ ଆମରା ଅଶୁଚି ହୁଏ ।

ମାତା-ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଅଶୌଚ କାଳେ ହବିଷ୍ୟାନ ବା ଫଳଫଳାଦି ଖେଳେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରତେ ହୁଏ । ଏସମୟ କଠୋର ସଂସକ ପାଲନ କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାର ଉପଯୁକ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରତେ ହୁଏ ।

ଅଶୌଚକାଳେ ଉଠାନେ ଏକଟି ତୁଳସୀ ଗାଛ ରୋଗନ କରେ ସେଥାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶେ ଜଳ ଓ ଦୁନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରତେ ହୁଏ ।

ପିତା-ମାତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଚତୁର୍ଥ ଦିନେ ଓ ଦଶମ ଦିନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରତେ ହୁଏ । ଏଇ ପିଣ୍ଡକେ ବଲା ହୁଏ ପୂରକପିଣ୍ଡ । ପୂରକ ପିଣ୍ଡ ଦିତେ ହୁଏ ମୋଟ ଦଶଟି । ଅଶୌଚାନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରକ ମୁଖନ କରେ ନବବନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରତେ ହୁଏ । ଅଶୌଚାନ୍ତେର ଦିତିଯ ଦିବସେ ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଅଶୌଚ ପାଲନେ ବର୍ଣ୍ଣିତର ପ୍ରତାବନ ଦେଖା ଯାଏ । ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଚେଯେ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଦେର ଅଶୌଚ ପାଲନେର ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ । ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଦଶଦିନ, କ୍ଷତ୍ରିୟେର ବାରଦିନ, ବୈଶ୍ୟେର ପନରଦିନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧେର ତ୍ରିଶଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନେର ବିଧାନ ଆଛେ । ତବେ ବର୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ବର୍ଗେର ବା ଗୋଟ୍ରେର ମାନୁଷ ଦଶ ଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ଏକାଦଶ କିଂବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସେ, କେଉଁ କେଉଁ ପନେର ଦିନ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ଘୋଡ଼ଶ ଦିବସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ଥାକେନ ।

ଜନନାଶୌଚ ଓ ମରଣାଶୌଚ ଭେଦେ ଅଶୌଚ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । କେଉଁ ଜନନାଶ୍ଵରଣ କରଲେ ଯେ ଅଶୌଚ ହୁଏ ତାର ନାମ ଜନନାଶୌଚ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଯେ ଅଶୌଚ ହୁଏ ତାର ନାମ ମରଣାଶୌଚ । ସଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ବର୍ତମାନ ଥାକେ । ସୁତରାଂ ସଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଜନନାଶୌଚ ଓ ମରଣାଶୌଚ ପାଲନ କରାର ନିୟମ ଆଛେ ।

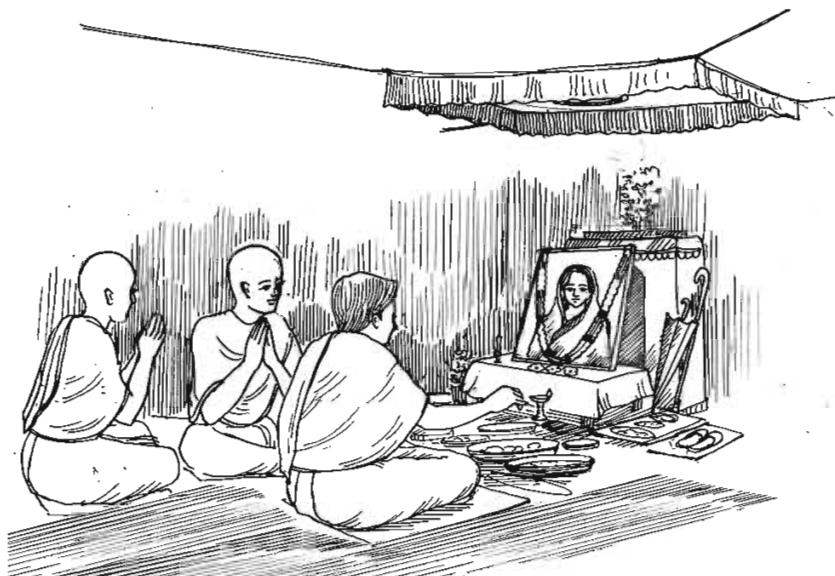
ଅଶୌଚ ପାଲନେର ଶୁରୁତ୍ୱ

ଅଶୌଚ ପାଲନ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତିଯ ବିଧି-ବିଧାନ ତା-ଇ ନନ୍ଦ, ସାମାଜିକ ଦିକ ଥେକେବେ ଏଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଛେ । ପିତା-ମାତାର ଜୀବନଶାୟ ସାରାଦିନ କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଘରେ ଫିରେ ଏଲେ ତାଁଦେର ସ୍ପର୍ଶ ଆମାଦେର ସ୍ଵର୍ଗସୁଖ ଦେଇ । ହଠାତ୍ କରେ ତାଁଦେର ଚିର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସନ୍ତାନକେ ବିଚଲିତ କରେ ତୋଳେ । ଏମନକି ନିକଟ ଆତୀୟ-ସଜନେର ମୃତ୍ୟୁର ଆମାଦେର ବିଷାଦଗ୍ରହ କରେ ତୋଳେ । ତାଁଦେର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କାମନାଯ ନିଜେଦେରକେ ପ୍ରଭୃତ କରତେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିଚଲିତ ମନେ ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରତି ସବିନ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ନା । ଏଜନ୍ୟ ଚାଇ ଶାନ୍ତ ମନ । ତାଇ ସମୟେର ପ୍ରୟୋଜନ । ଆର ଏ ପ୍ରଭୃତିର ଜନ୍ୟ ଅଶୌଚ ପାଲନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏତେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଫିରେ ଆସେ । ଏହାଡ଼ା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ଓ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଅଶୌଚ ପାଲନ କରେ ତାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ ।

ଏକକ କାଜ : ମରଣାଶୌଚ ପାଲନେର ବିଧାନଗୁଲୋ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

ପାଠ ୭ ଓ ୮ : ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧ

‘ଶ୍ରାଦ୍ଧ’ ଶବ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ‘ଅଣ୍ଟ’ ପ୍ରତ୍ୟଯୋଗେ ‘ଶ୍ରାଦ୍ଧ’ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ । ଶ୍ରାଦ୍ଧାର ସଙ୍ଗେ ଯା ଦାନ କରା ହୁଯ ତାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ । ସୁତରାଂ ସେଥାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧାର ସଂଯୋଗ ନେଇ ସେଥାନେ ଆଡ଼ୁମ୍ବର ଥାକଲେଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଯ ନା । କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର ପର



ପ୍ରଥମେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରଣୀୟ ତାକେ ବଲା ହୁଯ ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧ । ଅଶୌଚକାଳ ଉତ୍ସୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଲେ ପର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଯ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ । ସତଦୂର ଜାନା ଯାଇ, ନିମି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧର ସମୟ ଶାନ୍ତି ଛର, ଆଟ, ବୋଲ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଦାନେର ବିଧାନ ଆଛେ । ସାର ସେମନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମେତାରେ ଦାନଇ କରେ ଥାକେ । ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତେର ବିରାଟ ପର୍ବ ପାଠେରେ ବିଧାନ ଆଛେ । କୋନୋ କୋନୋ ଅଞ୍ଚଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାସରେ କଠୋପନିଷଦ ପାଠ କରା ହୁଯ ।

ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଦ୍ୟ ଏକୋନ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ । ଏକଜଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଯ ବଲେ ତାକେ ବଲା ହୁଯ ଏକୋନ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ । ଅର୍ଥାଂ ଏକଜଳର ଉଦ୍ଦେଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧାର ସାଥେ ଦାନ । ଆଦ୍ୟ ଏକୋନ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଵଳିତ କରେ ବାନ୍ଧପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଓ ଭୂଷାମୀର ପୂଜା କରଣୀୟ । ଅତଃପର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରତେ ହୁଯ । ଏହି ସମୟ ଆସନ, ଛାତା, ପାଦୁକା, ବଞ୍ଚ, ଅନ୍ନ, ଜଳ, ତାମ୍ବୁଳ, ମାଳା, ବିଛାନା ପ୍ରଭୃତି ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ନାମେ ମଞ୍ଚ୍ରଚାରଣସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରା ହୁଯ । ପରେ ପିଣ୍ଡାନ କରେ ଆଦ୍ୟ ଏକୋନ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରା ହୁଯ । ନାରୀରାଓ ଅଶୌଚ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲନ କରେ ଥାକେନ ।

ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ

ଆଦ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧର ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ଦିକ ଥେକେଇ ଶୁରୁ ଆହେ ତା ନୟ, ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦିକ ଥେକେଓ ଏଇ ଶୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ । କେଉଁ ମାରା ଗେଲେ ପାଡ଼ା-ପ୍ରତିବେଶୀ, ଆଜ୍ଞାଯ-ସ୍ଵଜନ ସେମନ ଦେଖିବାରେ ଆସେନ ତେମନି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାର ପରିବାର, ଜ୍ଞାତିବର୍ଗେର ଦୁଃଖେର ସାଥେ ଏକାତ୍ମ ହନ । ଏତେ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଆରାଓ ଦୃଢ଼ ହୁଯ । ସକଳେଇ ସମବ୍ୟଥୀ ହୁଯ । ପାଶାପାଶି ଆଜ୍ଞାଯ-ସ୍ଵଜନେର ଏକଟି

মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেক জনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

একক কাজ : আদ্যশান্ত করার সময় কী কী দান করতে হয় ?

অভিন্ন বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

হিন্দু সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণবিভাজন হয়। অর্থাৎ যে যে রকম পেশায় নিয়োজিত তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- ‘চাতুর্বর্ণ্যং যন্মা সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ’- অর্থাৎ - গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।

ত্রাক্ষণ সন্তান হলেই যে একজন ত্রাক্ষণ বলে গণ্য হবে, এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শুন্দের সন্তানও ত্রাক্ষণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার কোনো ত্রাক্ষণ-সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শুন্দ বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

অশৌচ পালনের দিবসসংখ্যায় তারতম্য ও অনুষ্ঠানের ভিন্নতা যৌক্তিক নয়। আর সেজন্যই বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের মানুষ দশ দিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করছেন। কিন্তু এটা স্বেচ্ছাকৃত। সকল বর্ণের জন্য অভিন্ন বিধান যৌক্তিক এবং হিন্দু সমাজের সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য অভিন্ন বিধান প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : পার্থিব, অষ্টদুর্গা, মোহাচ্ছল, জননাশৌচ, মরণাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, হবিষ্যান, মুগ্ন, বিষাদগ্রস্ত, প্রবর্তক, পাদুকা, তাম্বল, অঙ্কুরিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নারী-পুরুষ পরম্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. প্রাজাপত্য | খ. গান্ধৰ্ব |
| গ. আসুর | ঘ. ত্রাক্ষ |

২। সমাবর্তন বলতে কীরূপ অনুষ্ঠান বোঝায়?

- | |
|---|
| ক. পাঠ্যহণের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে গমন |
| খ. পাঠ্যহণকালে গুরুকে মূল্যবান উপহার প্রদান |
| গ. পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে বিদায়ানুষ্ঠান |
| ঘ. পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোপাল তার ঠাকুরদার একমাত্র নাতি। চোখের সামনে ঠাকুরদার মৃত্যুতে সে শোকাহত হয়। গোপাল দেখে মৃত্যুর পর তার ঠাকুরদার দেহটিকে ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে তার বাবা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা শুশানে নিয়ে যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী গোপাল ও তার বাবা মা-বার দিন অশৌচ পালন করেন।

৩। গোপালের ঠাকুরদাকে শুশানে নিয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি?

- ক. হিন্দুযান পালন খ. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন
- গ. আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন ঘ. অন্ত্যস্থিতিয়া সম্পন্ন

৪। তাদের অশৌচ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে-

- i. শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা
- ii. আত্মার শাস্তি কামনায় নিজেদের প্রস্তুত করা
- iii. শান্তীয় বিধি-বিধান পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

স্নাতক পরীক্ষা শেষে মিতার বাবা-মা তার বিবাহের দিন ধার্য করে। ঐদিন মিতাকে বন্ত ও অলংকার সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।

- ক. সংক্ষার কী?
- খ. কেন অন্যপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়?
- গ. মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মিতার বিবাহ কার্য সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

দেব-দেবী, পূজা, পূজার উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য শ্রেণিতে আমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা পূজা, পুরোহিতের ধারণা ও ঘোগ্যতা, দেবী দুর্গা, কালী, শীতলা ও কার্তিকের পূজা নিয়ে আলোচনা করব। দেবী দুর্গা ঐশ্বরিক মাতা যিনি সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর করে আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী কালী ঐশ্বরিক মহাশক্তি ও আশক্তীরপে যে-কোনো ধরনের দুর্বাগের সময় আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন। দেবী শীতলা লৌকিক দেবী হলেও আম বাঙ্গালী তিনি ঠাকুরানি নামে পরিচিত। তিনি শান্তির দেবী হিসেবে সকলের কাছে অতি পরিচিত। কার্তিক ভগবান শিবের পুত্র এবং দেব সেনাপতি। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তাঁকে রক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে পূজা করে থাকেন। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেব-দেবীর পরিচয়, পূজা পদ্ধতি, প্রণাম মন্ত্র ও সমাজ জীবনে এ সকল পূজার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- পূজা ও পুরোহিতের ধারণা ব্যাখ্যা এবং পুরোহিতের ঘোগ্যতা বর্ণনা করতে পারব
- দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- দুর্গা নামের ব্যৃৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেবী দুর্গার পরিচয় ও কল্প বর্ণনা করতে পারব
- দুর্গা পূজা পদ্ধতি (বোধন থেকে বিসর্জন) বর্ণনা করতে পারব
- দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কুমারী পূজা ও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দুর্গা পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নিজ জীবনাচারণে দুর্গা পূজার শিক্ষার অনুশীলনে উন্নুন্ন হব
- দেবী কালীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- কালী পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজ জীবনাচারণে কালী পূজার শিক্ষার অনুশীলন করতে পারব

- ଶୀତଳା ଦେବୀର ପରିଚୟ ଓ ପୂଜା ପର୍ଜତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- ଶୀତଳା ପୂଜାର ପ୍ରଗାମ ଯତ୍ରେର ସରଳାର୍ଥ ଓ ଏର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଶୀତଳା ପୂଜାର ଶୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- ନିଜ ଜୀବନାଚରଣେ ଶୀତଳା ପୂଜାର ଅଭାବ ଉପଲକ୍ଷି କରେ ପୂଜା-ଅର୍ଚନା ଅନୁଶୀଳନେ ଉତ୍ସୁକ ହବ
- କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବେର ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଗାମ ଯତ୍ରେର ସରଳାର୍ଥ ଓ ଏର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜାର ଶୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ ଏବଂ ଦେବ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ଦେବେର ଶିକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷି କରେ ପୂଜାର୍ଚନା ଅନୁଶୀଳନେ ଉତ୍ସୁକ ହବ ।

ପାଠ ୧ : ପୂଜା ଓ ପୁରୋହିତ

‘ପୂଜା’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାନାନୋ, ଯା ପୁଞ୍ଚ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅର୍ଚନା ବା ଉପାସନାର ମାଧ୍ୟମେ କରା ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ‘ପୂଜା’ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଈଶ୍ୱରେ ପ୍ରତୀକ ବା ତାଁର କୋନୋ ଙ୍କପକେ (ଦେବ-ଦେଵୀ) ସନ୍ତୃଷ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ ଡକ୍ଟି ସହକାରେ ଫୁଲ, ଦୂର୍ବୀ, ତୁଳସୀ ପାତା, ବିଷପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ଆତପଚାଳ, ଧୂପ, ଦୀପ ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ଦିଯେ ବିଶେଷ ପର୍ଜତିତେ ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଚେ ସର୍ବଶିଳ୍ମିମାନ ଈଶ୍ୱରର କାହେ ବା ଦେବ-ଦେଵୀଦେର କାହେ ମାଥା ନତ କରା ଏବଂ ତାଁଦେର ସାନ୍ତ୍ରିକ୍ୟ ଲାଭେର ପ୍ରୟାସ । ଆମରା ଜାନି, ଦେବ-ଦେଵୀରା ଈଶ୍ୱରେର ଶୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ । ତାଇ ଦେବ-ଦେଵୀଦେର ସନ୍ତୃଷ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନାଦି କରା ହୁଏ ତାକେ ‘ପୂଜା’ ବଲେ ।

ପୁରୋହିତ

ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦଟି ‘ପୁରସ୍’ (ପୁରଃ) ଏବଂ ‘ହିତ’ ଶବ୍ଦେର ସମସ୍ତମେ ଗଠିତ । ପୁରସ୍ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ସମ୍ମୁଖେ ଏବଂ ହିତ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଅବହାନ । ସମ୍ମୁଖଭାଗେ ଯିନି ଅବହାନ କରେନ ତିନି ପୁରୋହିତ । ସାଧାରଣ ଅର୍ଥେ ପୁରୋହିତ ବଲତେ ପୂଜା-ଅର୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କେ ବୋକାନୋ ହୁଏ ଏବଂ ଯିନି ପୂଜାର ସମସ୍ତ ସକଳେର ଅଭାଗେ ଅବହାନ କରେନ । ସାଧାରଣଭାବେ ଯିନି ପୂଜା-ଅର୍ଚନାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେନ ଏବଂ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ସକଳେର ଅଭାଗେ ଥାକେନ, ତାଙ୍କେ ପୁରୋହିତ ବଲେ । ଏଟା ଏକଟା ପେଶାଓ ବଢ଼େ । ଯାର ନାମେ ସଂକଳ୍ପ କରେ ପୂଜା କରା ହୁଏ ତାକେ ସଜ୍ଜମାନ ବଲେ । ସଜ୍ଜମାନ ନିଜେও ପୂଜା କରତେ ପାରେନ । ତବେ ସାଧାରଣତ ସଜ୍ଜମାନ ପୁରୋହିତଙ୍କେ ପୂଜା କରେ ଦେଇବାର ଜନ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆନେନ । ସାଧାରଣତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେରାଇ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରେ ଥାକେନ । ତବେ ପୁରୋହିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ କଥା ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଲତେ ସ୍ଥାନେର ବ୍ରାହ୍ମବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ



ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରণା ଆଛେ ବା ଯିନି ବ୍ରାହ୍ମବିଦ, ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ବୋବାନୋ ହ୍ୟ । ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ସମୟ ସଂକୃତ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତର୍ଜାନ ଥାକା ପ୍ରୟୋଜନ । ଯାରା ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଯଜନ-ୟାଜନ କରତେନ, ତାଁରା ଛିଲେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପଦାୟେର । ତାଇ ପୌରୋହିତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣେରଇ ପେଶା ଛିଲ । ଏକାଳେ ସଂକୃତ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତର୍ଜାନ ସକଳ ବର୍ଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଦେଖା ଯାଯ । ସୁତରାଂ ଏକାଳେ ସଂକୃତ ଭାଷା ଓ ଶାନ୍ତ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଯେକୋନୋ ବର୍ଣେର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ଯୋଗ୍ୟ । ପୁରୋହିତେର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣାବଳି ଥାକା ପ୍ରୟୋଜନ :

ପୁରୋହିତେର ଗୁଣାବଳି

ପୁରୋହିତ ଏକଜନ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ତିନି ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ପୂଜା-ଅର୍ଚନାଦି ପରିଚାଳନା କରେ ଥାକେନ । ଏ କାରଣେଇ ତାଁକେ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣେର ଅଧିକାରୀ ହତେ ହ୍ୟ-

୧. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାବଲୟୀ ଯେ-କୋନୋ ବର୍ଣେର ମାନୁଷେର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରାର ସାମର୍ଥ୍ୟ
୨. ସଂକୃତ ଭାଷା ଲେଖା ଓ ପଡ଼ାର ମତୋ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା
୩. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ
୪. ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କେ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରণା
୫. ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତି-ନୀତି ଓ ପ୍ରଥାର ଉପର ଅଭିଜ୍ଞତା
୬. ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ ଧର୍ମମୁରାଗୀ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ଜନସାଧାରଣେର ପ୍ରତି ମମତ୍ବୋଧ
୭. ଶୁଦ୍ଧଭାବେ ମତ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେର ଦକ୍ଷତା
୮. ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମ-ନୀତି ସମ୍ପର୍କେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା
୯. ପରିଷାର-ପରିଚଳନା
୧୦. ଆଚରଣଗତ ଦିକ ଥେକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସୃ, ନ୍ୟାୟପରାଯଣ ଏବଂ କଥା ଓ କାଜେର ସମ୍ବ୍ୟ
୧୧. ଶିଷ୍ଟାଚାରସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବେର ଅଧିକାରୀ

ପାଠ ୨ : ଦେବ-ଦେବୀର ଧାରଣା

ଈଶ୍ୱର ସୀମାହୀନ ଗୁଣ ଓ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ । ତିନି ଯଥନ ନିଜେର କୋନୋ ଗୁଣ ବା କ୍ଷମତାକେ କୋନୋ ବିଶେଷ ଆକାର ବା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେନ, ତଥନ ତାଁକେ ଦେବତା ବଲେ । ଦେବତାରା ଆଲାଦା ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଲେଓ ଈଶ୍ୱର ନନ । ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଦ୍ଵିତୀୟ । ଦେବତାରା ଏକ ଈଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ । ଝଗ୍ବେଦେର ଏକଟି ମତ୍ରେ ବଲା ହେୟେଛେ-

‘ଏକେ ସଦ୍ ବିଦ୍ମା ବହୁଧା ବଦ୍ଧି ।’

ଅର୍ଥାଂ ଏକ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ରକ୍ଷକେ ବିଶ୍ରଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀରା ବହୁ ନାମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ଦେବତାଦେର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବା କ୍ଷମତାର ଜନ୍ୟ ତାଁଦେର ପୂଜା କରା ହ୍ୟ । ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ତାଁରା ଖୁଶି ହନ । ମାନୁଷ ଦେବତାଦେର କୃପା ଲାଭ ଏବଂ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିତେ ବସବାସ କରାର ଜନ୍ୟ ପୂଜା କରେ । ଦେବତାଦେର ପୂଜା କରିଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହନ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦାନ କରେନ ।

দেব, দেবী বা দেবতা শব্দ 'দিব' থাকু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দিব + অচ = দেব। জীলিহে দেবী বলা হয়। দিব ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই বলা হয়েছে, যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্তু, তিনি দেবতা। দেব-দেবী ও দেবতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা। পুরাণে খ্যানলক্ষ দেবতাদের বিশ্ব বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করার বিধান উন্নিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বেদে দেবতাদের দেহ অস্ত্রময়।

দেবতাদের প্রেরণিভাগ

হিন্দুধর্মবলবীদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের উপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজা-প্রণালি বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম হঙ্গের উপর ভিত্তি করে দেব-দেবীদের নিম্নলিখিত ভাগ করা হয়েছে-

১. বৈদিক দেবতা
২. গৌরাণিক দেবতা এবং
৩. শোকিক দেবতা।

ক. বৈদিক দেবতা : বেদে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন- অগ্নি, ইন্দ্ৰ, যিতা, রূদ্ৰ, বৰুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরোবরী, উষা, অদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিশ্ব বা মৃত্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক পূজাপূজ্যতা ছিল যোগ বা হোম ভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা ঝীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করা হতো। অগ্নিকে বলা হয়েছে- তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, দীক্ষিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক।



ଯଜ୍ଞର ଅଳ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ ଅନ୍ତିମ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାର ଅଳ୍ୟ ସ୍ମୃତ, ପିଠା, ପାରୋସ, ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଗଣ କରା ହତୋ । ବୈଦିକ ଆସିରା ବିଶ୍ୱବିକାଶରେ କର୍ମକାଙ୍କେ ଏକଟି ବୃହଂ ଯଜ୍ଞ ବଲେ ମନେ କରାନେ । ତାଇ ତାଁଦେର ଯଜ୍ଞକର୍ମ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞର ପ୍ରତୀକ ହରେ ଉଠେଛିଲ । ଏ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞଇ ହିଁ ଥିଥାନ ଧର୍ମକର୍ମ । ଯଜ୍ଞର ମାଧ୍ୟମେ ବୈଦିକ ଆସିରା ଦେବ-ଦେଵୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରାନେ ।

୪. ଶୌରାଣିକ ଦେବତା : ପୁରାଣେ ସେ-ସକଳ ଦେବତାର ବର୍ଣ୍ଣା କରା ହେଁଥେ, ତାଁଦେର ଶୌରାଣିକ ଦେବତା ବଲା ହୁଏ । ସେମନ, ବ୍ରାହ୍ମ, ବିଶ୍ୱ, ଶିବ, ଦୂର୍ଗା, ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭୃତି ।

ଶୌରାଣିକ ଯୁଧେ ବୈଦିକ ଦେବତାଦେର ଅନେକେଇ ଜ୍ଞାପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେହେ ଏବଂ ଅନେକ ନତ୍ତନ ଦେବତାର ଆବିର୍ଜନ୍ମ ଘଟେହେ । ସେଦେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକେ ପୁରାଣେ ଦେଖା ଯାଏ ଶତ-ଚତୁର୍ଦ୍ଦା-ପଦା-ପଞ୍ଚଧାରୀଜ୍ଞାପେ । କିନ୍ତୁ ସେଦେ ବିଶ୍ୱର ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଯନ୍ତ୍ରମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ମାତ୍ର । ସେଦେର ବିଶ୍ୱ ମୂଳତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ।

୫. ଶୌକିକ ଦେବତା : ସେଦେ ଓ ପୁରାଣେ ସେ-ସକଳ ଦେବତାର କଥା ବଲା ହୁଏ ନି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ଵଗଣ ତାଁଦେର ପୂଜା କରେନ, ତାଁଦେର ବଲା ହୁଏ ଶୌକିକ ଦେବତା । ସେମନ- ମନ୍ଦୀର, ଶୀତଳା, ଦକ୍ଷିଣ ରାତ୍ର ପ୍ରଭୃତି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ମନ୍ଦୀର ଦେବୀସଙ୍କ ଆରାଧ ଅନେକ ଶୌକିକ ଦେବତା ପୁରାଣେ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହରେହେନ ।

ଦେବ-ଦେଵୀର ପୂଜା

ସକଳ ଦେବ-ଦେଵୀର ପୂଜା ଏକଇ ସମୟ କରା ହୁଏ ନା । ଅନେକ ଦେବ-ଦେଵୀର ଅଳ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ, ସମସ୍ତ, ତିଥି ରହେହେ । ସେମନ ବିଶ୍ୱ, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନଇ କରା ହୁଏ । ଆବାର ବ୍ରାହ୍ମ, କାର୍ତ୍ତିକ, ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେବ-ଦେଵୀର ପୂଜା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ତିଥିତେ କରା ହୁଏ । ସାମାଜିକ ଅଂଶପ୍ରହଗଗତ ଦିକ ଧେକେ ପୂଜା ଦୂଇଭାବେ କରା ହୁଏ- ପାରିବାରିକ ପୂଜା ଓ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟଦେର ଅଂଶପ୍ରହଗେ ମାଧ୍ୟମେ ସେ ପୂଜା କରା ହୁଏ ତାକେ ପାରିବାରିକ ପୂଜା ବଲେ । ସମାଜେର ସକଳ ମାନୁଷେର ଅଂଶପ୍ରହଗେ ସେ ପୂଜା କରା ହୁଏ ତାକେ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ବଲେ । ମୂଳତ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଉଦ୍‌ଦ୍ୱାରାନେର ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ସବେର ସୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।



ପାଠ ୩ : ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା : ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ପରିଚୟ ଓ ଜ୍ଞାପ

ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ଇଶ୍ୱରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ତିନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାମାୟା ଅର୍ଦ୍ଦ ମହାଜ୍ଞାଗତିକ ଶକ୍ତି । ତିନି ଜୟଦୂର୍ଗା, ଅଗନ୍ତୁରୀ, ଗଞ୍ଜେଶ୍ୱରୀ, ବନଦୂର୍ଗା, ଚନ୍ଦ୍ରୀ, ନାରାୟଣୀ ପ୍ରଭୃତି ନାମେର ପୂଜିତା ହନ ।

ଦୂର୍ଗା ନାମେର ସ୍ଥୁତପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥ

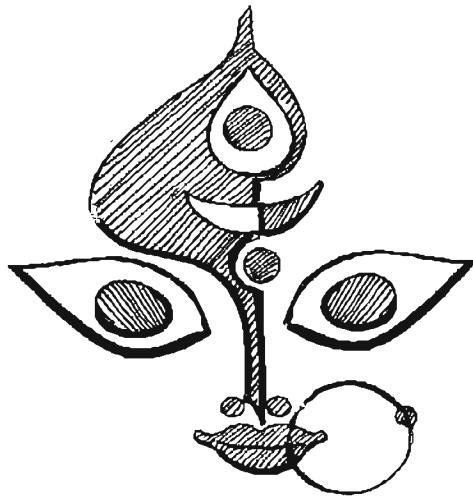
ଦୂଃ - ଗମ + ଅ = ଦୂର୍ଗ । ସେ ହାନେ ଗମନ କରା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଦୂରହ ତାକେ ଦୂର୍ଗ ବଲେ । ଦୂର୍ଗ ଶବ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ଆ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରେ ଦୂର୍ଗା ଶବ୍ଦଟି ଗଠନ କରା ହସ୍ତେ ଏବଂ ଜ୍ଞାଲିଙ୍ଗେ ସ୍ଵରହାର କରା ହସ୍ତେ । ଯିନି ଯହାମାଯା ତିନି ଦୂରଧିଗମ୍ୟ - ତାକେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ସାଧନାର ଦୀର୍ଘ ପାଇଁ ଯାଇ । ତାଇ ତିନି ଦୂର୍ଗା । ତିନି ବ୍ରକ୍ଷେର ଶକ୍ତି ବଲେଓ ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ । ଆବାର ଦୂର୍ଗମ ନାମକ ଅସୁରକେ ବଧ କରେଛେ ବଲେଓ ତାକେ ଦୂର୍ଗା ବଲା ହୁଏ । ଦୂର୍ଗା ଶବ୍ଦେର ଆରୋକଟି ଅର୍ଥ ହଲୋ ଦୂର୍ଗତିଳାଶିନୀ ଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମହାବିଷ୍ଵେର ସାବତୀର ଦୁଃ୍ଖ-କଷ୍ଟ ବିନାଶକାରିଣୀ ଦେବୀ ।

ଏକବାର ମହିଷାସୁର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରେର କାହ ଥେକେ ସର୍ଗରାଜ୍ୟ କେଡ଼େ ନିଯୋଜିଲ । ତଥନ ଦେବତାଦେର ସମ୍ମିଳିତ ତେଜ ଥେକେ ଆବିର୍ଭୃତ ହସ୍ତେଛିଲେନ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରେଛିଲେନ । ଏହାରେ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାକେ ମହିଷମଦିନୀ ବଲା ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁରା ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥେକେଇ ଭକ୍ତିଭରେ ତାର ପୂଜା କରେ ଆସିଛେ । ଦୂର୍ଗା ପୂଜାଯ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସକଳ ଶ୍ରେଣିର ଜନମାଧାରଣ ନାନାଭାବେ ଅଂଶପଦ୍ଧତି କରେ ଥାକେ । ଏ କାରଣେଇ ଦୂର୍ଗା ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜେ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ସବ ହିସେବେ ବିବେଚିତ ।

ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ରୂପ

ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା ଦଶଭୂତୀ । ତାର ଦଶଟି ଭୂତ ବଲେଇ ତାର ଏହି ନାମ । ତାର ଦଶଟି ହାତ ତିନଟି ଚୋଥ ରଯେଛେ । ଏ ଜନ୍ୟ ତାକେ ତିନିମନ୍ଦିର ବଲା ହୁଏ । ତାର ବାମ ଚୋଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଡାନ ଚୋଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା କପାଳେର ଉପର ଅବହିତ ଚୋଥ - ଜ୍ଞାନ ବା ଅଶ୍ଵିକେ ନିର୍ଦେଶ କରେ । ତାର ଦଶ ହାତେ ଦଶଟି ଅନ୍ତରେ ରଯେଛେ ଯା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣୀ ଶିଂହ ତାର ବାହନ ।

ଶିଂହ ଶକ୍ତିର ଧାରକ । ଦେବୀ ହିସେବେ ଦୂର୍ଗାର ଗାୟେର ରଙ୍ଗ ଅତ୍ସୀ ଝୁଲେର ମତୋ ସୋନାଲି ହଲୁଦ । ତିନି ତାର ଦଶ ହାତ ଦିଯେ ଦଶଦିକ ଥେକେ ସକଳ ଅକଳ୍ୟାଗ ଦୂର କରେନ ଏବଂ ଆମାଦେର କଳ୍ୟାଗ କରେନ । ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ଡାନଦିକେର ପ୍ରାଣ ହାତେର ଅନ୍ତରୁଲୋ ସଥୀକରିତ ତିଶ୍ଚଳ, ଖଡ଼ଗ, ଚକ୍ର, ବାଣ ଓ ଶକ୍ତି । ବାମଦିକେର ପ୍ରାଣ ହାତେର ଅନ୍ତରୁଲୋ ହଲୋ ଖେଟକ (ଢାଳ), ପୂର୍ଣ୍ଣାପ (ଧନୁକ), ପାଶ, ଅକ୍ଷୁଷ, ସଟ୍ଟା, ପରଣ (କୁଠାର) । ଏ ସକଳ ଅନ୍ତରେ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ଶୁଣେର ପ୍ରତୀକ ।



পাঠ ৪ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি

উৎসবের সময় ও পূজার উপকরণ

দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বছরে দু'বার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয় এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় মহালয়া উদয়াপনের মাধ্যমে দেবীদুর্গার আগমনী ঘোষিত হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে প্রতিমা স্থাপন করে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয় এবং পাঁচ দিনব্যাপী চলতে থাকে। দশম দিনে দশমী পূজার মাধ্যমে শারদীয় উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। কোনো কোনো স্থানে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে দুর্গাপূজা শুরু করা হয়। তবে ষষ্ঠী তিথি থেকে আনন্দানিকভাবে দুর্গাপূজা শুরু করার সীমিতই অধিক অনুসৃত।

তিথি অনুসারে দুর্গাপূজার সময়কে নিম্নরূপে শ্রেণিবিভাগ করা হয় -

প্রথম দিন : দুর্গার ষষ্ঠী-বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস;

দ্বিতীয় দিন : মহাসপ্তমী পূজা- নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারণ্ত, সপ্তমীবিহিত পূজা;

তৃতীয় দিন : মহাষ্টমী পূজা, কুমারী পূজা, সন্তোষপূজা; চতুর্থ দিন : নবমীবিহিত পূজা; পঞ্চম দিন : দশমীপূজা, বিসর্জন ও বিজয়া দশমী।

বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্গাপূজায় বহু উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ৫ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা

ষষ্ঠীপূজা

মহালয়া অমাবস্যার পরে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজার আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়।

সুষ্ঠুভাবে পূজা উদয়াপন করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করা হয়। সন্ধ্যাকালে বোধন, তারপর অধিবাস ও আমন্ত্রণ অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তমীপূজা

ষষ্ঠীর পর আসে মহাসপ্তমী। এ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমীবিহিত পূজা। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাগপ্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা উপকরণে ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়। এদিনের পূজায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

নবপত্রিক মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো—কদলী (কলা), দাঢ়িম (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকুচু), কচু, বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়স্তী। একটি কলাগাছের সঙ্গে অন্য গাছের ২৫ চারা বেঁধে দেয়া হয়। তারপর একটি শাঢ়ি কাপড় পরানো হয়। একে বলা হয় কলাবৌ। নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ননামে অধিষ্ঠিত। মূলত নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী

बृक्षके पूजा करि । बृक्षके संतुष्टिपूजा करि । आर एই बृक्षके मध्ये आहे इश्वरारे शक्ति, देवीर शक्ति । नवगत्तिकार यथा दिये आमरा देवी दुर्गाकैपूजा करि । देवीदुर्गाके विर्दिष्ट प्रधामवत्रे प्रधाम करा हर ।

अंगाम मंत्र-

ॐ सर्वमदलायदल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।

श्रवण्ये ग्रन्थक गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते । (श्रीग्रीचटी, ११/१०/११)

वाह्ना अर्च : हे देवी सर्वमदला, शिवा, सर्वार्थसाधिका, श्रवण्योग्या, गोरि, जिनवना, नारायणि- तोयाके नमकार ।



अंगाम मंत्रेर शिक्षा

देवी दुर्गा विभिन्नक्षेत्रे आविर्भूत हर्ये थाकेल एवं आमादेव मंडल निश्चित करेल । ताही तिनि सर्वमदला । तिनि शिवा अर्थात् महलमरी । शिवेर शक्ति वलेण तिनि शिवा । तिनि सकल प्रार्थना पूरण करेल, तांर असाध्य किछुइ नेहे । तिनि श्रवण्य । तिनि गोरी । तांर काहे शक्ति प्रार्थना करो आमरांश अन्यायारे विरक्ते दाँडाव एवं लिङ्गेर उ समाजेर जन्य महलजनक काज करव । दुर्गापूजार प्रधामवत्र आमादेव ए शिक्षाइ देय ।

पाठ ६ ओ ७ : महा अष्टमी पूजा ओ कुमारी पूजा

शारदीय दुर्गा उत्सवे अष्टमी पूजा अत्यन्त उत्कृष्टपूर्ण पूजा । ए दिने देवी दुर्गा यजिरासुराके वध करेव विजय लाभ करेहिलेन । ए पूजार दिने उत्कृष्ट विष्णस्यात्तत्वाबे अष्टमीविहित पूजा करो देवी दुर्गाय कृपा प्रार्थना करेल । पूजार शेवे पूजारीपांख देवीर उद्देशे पुस्पाशुभि घोदान करो ।

कुमारी पूजा

अष्टमी पूजार दिन कुमारी पूजा करा हय । आमादेव देशे केवल रामकृष्ण मठे कुमारी पूजा अनुष्ठित हर । पाठिमवहेण श्रधानात रामकृष्ण मठे कुमारी पूजा हर । नारीके शाक्तज्ञपे इश्वरीक्षेत्रे भावना हिन्दूसाधना-पूजार एकटा बड दिक । कुमारीर यथा दिये देवी दुर्गारहि पूजा करा हय । कुमारी पूजार नारीर श्रिति सम्मान प्रदर्शन करा हय ।



এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

নবমী ও দশমী পূজা

নবমী পূজা

নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার নবমীবিহিত পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সঙ্গের সময় বিশেষভাবে সঙ্গি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গি পূজায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্ঞলন করে দেবীর পূজা করা হয়। এ সময় দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং ভজনের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দশমী পূজা

দশমী তিথিতে পূজাবিধি অনুসারে দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা করা হয়। দশমীর দিনে হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন। পূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে। তিনি শুশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আসেন। চারদিন থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৈলাস ভবনে যাত্রা করেন। দুর্গাপ্রতিমা নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও আচার

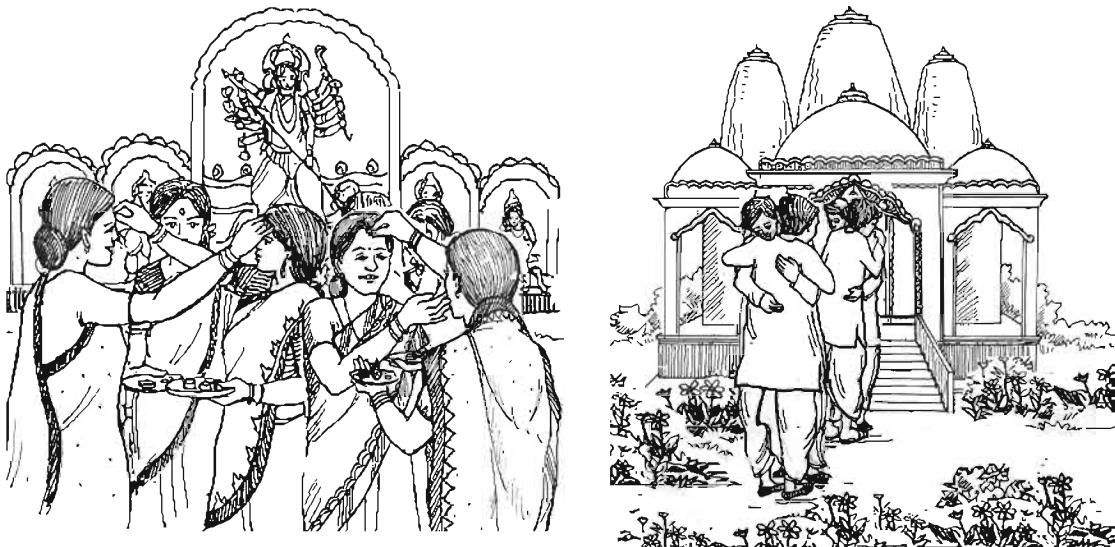
দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রথান আচারের মধ্যে আছে-

১. দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সন্তান্ত জানানো।
২. সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৩. পরম্পরার আলিঙ্গন করা এবং মিষ্টিমুখের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধকরণ।
৪. আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিছিল করে ঢাক, কাসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন।
৫. বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান- দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা।
৬. আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান প্রভৃতি।

বিসর্জনের দিন বা পরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয়া দশমীর তাৎপর্য

১. মহিষাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হয়। সুতরাং এ দশমী বিজয়ের দিন। অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন।
২. দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমী ঐক্যের প্রতীক।
৩. বিজয়া দশমী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভশক্তিকে দূর করতে উদ্বৃদ্ধ করে এবং পারম্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করে।



বিজয়া দশমীর প্রভাব

দুর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিরোধ করার শক্তি জাগ্রত করে।

সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্ৰ-পত্ৰিকায় পূজাসংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পূজাসংগঠন শারদীয় পূজার স্মরণিকা প্রকাশ করে। পূজায়গুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পূজামণ্ডপ এবং প্রতিমায় নানা নান্দনিক কল্পকল্পনার প্রতিফলন হয়। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে দুর্গাপূজার প্রভাব

আবহমানকাল থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। এ উৎসব তাদের প্রাণ। শারদীয় দেবীর পূজা মানে দেবী দুর্গার আরাধনা। তিনি বিশ্বের আদি কারণ এবং ইশ্বরের শক্তির রূপ। দুর্গাপূজা আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের উন্নয়নে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ৮ ও ৯ : দেবী কালী—কালী দেবীর পরিচয়

দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অস্তু শক্তিকে ধ্বনি করেন।

কালী ভগবান শিবের সহধূমিণী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শুশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ছাড়াও দেবী কালীর অনেক নাম রয়েছে। যেমন ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী ইত্যাদি।

দেবী কালীর উৎপত্তি

দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নাম বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের খৎস করে শর্ণের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুষ্ঠি ও নিশুষ্ঠি নামক অসুরের হাত থেকে পরিআশ পাওয়ার জন্য দেবী অধিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অধিকা ক্ষেত্রে উন্নত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর- অধিকা ও কালিকা বা কালী। শুষ্ঠি ও নিশুষ্ঠির অনুচর চও ও মুগ্ধকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুঙ্গ।

কালী পূজার সময় :

কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অঞ্চাহমণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সক্ষ্যাত সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারীর (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, বড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।

কালীপূজা পঞ্জি

দুর্গা পূজার মতো কালী পূজাও গৃহে বা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালী পূজা শুরু হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

কালীপূজার প্রণাম মন্ত্র, সরলার্থ ও শিক্ষা

কালী পূজার ধ্যান

ॐ শ্বারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর-দন্তোবরপ্রদাম্ ।
হাস্যমুক্তাং ত্রিনেদ্রাঙ্গ কপালকর্তৃকরাম ॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ ।
চতুর্বীভ্যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥



সরলার্থ : দেবী কালী শ্বারূঢ়া, ভীমা ভয়ঙ্করী, তিনি ত্রিনয়নী, ভয়ানক তাঁর দাঁত, লোল জিহ্বা তাঁর। তিনি মুক্তকেশী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা (কাটারি)। অপর দুহাতে বর ও অভয় মূদ্রা, দেবী আবার হাস্যময়ী। এখানে কোমল ও কঠোর রূপে দেবী কালীর রূপ বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষা

১. দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর

কাছ থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। দেবী কালীর কাছে আমরা অন্যায়ের কাছে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই।

২. অন্যায়কারীর কাছে দেবী রাগী, ভয়ংকরী। ভক্তের কাছে মেহময়ী জননী।

আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব

দেবী কালী ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একাধারে কঠোর, অপরদিকে ক্ষমতাময়ী মা। তিনি এ বিশ্বের সকল অত্যন্ত শক্তি খণ্ডন করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেবী কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে থাকেন। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কার্তিক

পাঠ ১০ : কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও ধ্রোমমন্ত্র

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুষ্ঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী।

পূরাণে আছে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে
বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্ণের দেবতারা তাঁকে
সেনাপতিবৃপ্তে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তঙ্গ স্বর্ণের
মতো।

মুক্তাঙ্গ হিসেবে কার্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও
বল্লুম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাঞ্চ ময়ুর।
কার্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ
করেছেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ
করেছিলেন। পূরণ অনুসারে তারকাসুরকে বধ
করার জন্য কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বলির
পুত্র বাণাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্তিকের
অন্য নাম কৃন্দ, মহাসেন, কুমার শুহ ইত্যাদি।
কৃন্দপূরাণ কার্তিককে নিম্নে বরচনা করা হয়েছে।

কার্তিক পূজা

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার
আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে
দম্পত্তিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন।
কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে শ্রগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে জাত করেছিলেন।



কার্তিক দেবতার ধ্যান

ওঁ কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ুরোপরিসংস্থিতম্ ।
 তঙ্গকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্ ॥
 দিঙ্গজং শক্রহস্তারং নানালক্ষারভূষিতম্ ।
 প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্ ॥

সরলার্থ : কার্তিকদেব মহাভাগ, ময়ুরের উপর তিনি উপবিষ্ট । তঙ্গ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ । তাঁর দুটি হাতে শক্তি নামক অস্ত্র । তিনি নানা অলংকারে ভূষিত । তিনি শক্র হত্যাকারী । প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল তাঁর মুখ ।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিসূন্দন ।
 প্রণোতোৎ মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন ॥
 রূদ্রপুত্র নমস্ত্ব্যং শক্তিহস্ত বরপ্রদ ।
 ষান্মাতুর মহাভাগ তারকান্তকর প্রভো ।
 মহাতপস্তী ভগবান্ পিতুর্মাতুঃ প্রিয় সদা ॥
 দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতস্ত্রং গিরিশিখরে ।
 শৈলাত্মজায়াং ভবতে তুভ্যং নিত্যং নমঃ ॥

সরলার্থ : হে মহাভাগ, দৈত্যদলনকারী কার্তিক দেব তোমায় প্রণাম করি । হে মহাবাহু, ময়ুর বাহন, তোমাকে নমস্কার । হে রূদ্রের (শিব) পুত্র, শক্তি নামক অস্ত্র তোমার হাতে । তুমি বর প্রদান কর । ছয় কৃতিকা তোমার ধাত্রীমাতা । জনক-জননী প্রিয় হে মহাভাগ, হে ভগবান, তারকাসুর বিনাশক, হে মহাতপস্তী প্রভু তোমাকে প্রণাম । দেবতাদের যজ্ঞ রক্ষার জন্য পর্বতের চূড়ায় তুমি জন্মগ্রহণ করেছ । হে পার্বতী দেবীর পুত্র তোমাকে সতত প্রণাম করি ।

কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব

১. কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা । অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ । এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পত্তিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন ।
২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি । তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা । এজন্য তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয় ।
৩. কার্তিক ন্য ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা । কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা । তিনি তারকাসুর পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি । তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি ।

୫. ଆମାଦେର ସକଳକେଇ କାର୍ତ୍ତିକେର ମତୋ ନୟ ଓ ବିନୟୀ ହେଉଥା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାଯ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବିଚାରେର ବିକ୍ରିଜ୍ଞ ସୋଜାର ହେଉଥା ଉଚିତ ।

ପାଠ ୧୧ : ଦେବୀ ଶ୍ରୀତଳା

ଶ୍ରୀତଳା ଦେବୀର ପରିଚୟ

- ଶ୍ରୀତଳା ଲୌକିକ ଦେବୀ । ଶ୍ରୀତଳା ପୁରାଣେ ଗୃହୀତ ହେଁ ପୌରାଣିକ ଦେବୀତେ ପରିଣତ ହେଁଛେ । ସାଧାରଣତାବେ ଏ ଦେବୀ ବସନ୍ତ ରୋଗେର ଜ୍ଵାଳା ନିବାରଣ କରେ ଶ୍ରୀତଳ କରେନ ବଳେ ଶ୍ରୀତଳା ନାମେ ପରିଚିତ ହେଁଛେ । ବସନ୍ତ ଓ ଚର୍ମରୋଗ ଥେକେ ପରିଆଶେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜା କରା ହୁଏ ।
- ଦେବୀ ଶ୍ରୀତଳାକେ ଠାକୁରାନି ଜାଗରଣୀ, ବରଣୀ, ଦୟାମଣୀ ପ୍ରଭୃତି ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହୁଏ । ଶ୍ରୀତଳା କୁମାରୀ, ମାଥାର କୁଳାକୃତିର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଗର୍ଦନ୍ତର ଉପର ଉପବିଷ୍ଟ । ଗର୍ଦନ୍ତ ତାଁର ବାହନ । କନ୍ଦପୁରାଣେ ଶ୍ରୀତଳା ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୂହାତ ବିଶିଷ୍ଟ । ତାଁର ଦୂହାତେ ରଯେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଟ ଓ ସମାଜନୀଧାରଣୀ । କଥିତ ଆଛେ ସମାଜନୀର ମାଧ୍ୟମେ ତିନି ଅମୃତମୟ ଶ୍ରୀତଳ ଜଳ ଛିଟିଯେ ରୋଗ, ତାପ, ଶୋକ ଦୂର କରେନ । କଥନୋ କଥନୋ ତିନି ନିମ୍ନେ ପାତା ବହନ କରେ ଥାକେନ । ନିମ୍ନ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଉପିଦିଦ ।

ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜା

ସାଧାରଣତ ଶ୍ରାବଣ ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ସନ୍ତ୍ରୀ ତିଥିତେ ଦେବୀ ଶ୍ରୀତଳାର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପୂଜାମନ୍ଦିରେ ବା ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ପୂରୋହିତେର ମାଧ୍ୟମେ ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପୂଜାର ପଞ୍ଜତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାର ଅନୁ଱ାପ ହେଁବେ ଏ ପୂଜାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଫଳେର ପ୍ରଯୋଜନ ହୁଏ । ପେପେ, ନାରିକେଳ, ତରମୁଜ, କଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଟିଜାତୀୟ ଉପକରଣ ଦେବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ସମର୍ପଣ କରା ହୁଏ । ଏ ପୂଜାର ସକଳ ଶ୍ରେଣିର ଭକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତଙ୍କ କରେ ଥାକେ ।

ପୂଜାର ପ୍ରଣାମ ମତ୍ର

ଓଁ ନମାମି ଶ୍ରୀତଳାୟ ଦେବୀୟ ରାସତଥାୟ ଦିଗଭାରୀୟ ।
ମାଜ୍ଜନୀକଳସୋଗେତାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲଙ୍ଘତମନ୍ତକାମ୍ୟ ।

ସରଳାର୍ଥ : ଗର୍ଦନ୍ତ ବାହନ ମାଜନୀ (ବୌଟା) ଓ କଳସ-
ହତ୍ତା ଶ୍ରୀତଳା ଦେବୀକେ ପ୍ରଣାମ କରି ।

ଶ୍ରୀତଳା ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ

1. ଶ୍ରୀତଳା ଦେବୀ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଥେକେ ଆମାଦେର ମୁକ୍ତ
କରେ ଆମାଦେର ଶ୍ରୀତଳ କରେନ । ଏ କାରଣେ ତିନି
ସକଳେର କାହେ ସମାଦୃତ ହେଁଛେ ।



୨. ଦେବୀ ଶୀତଳାକେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବିଧି ପାଲନ ବା ପରିଷକାର-ପରିଚଛନ୍ନତାର ଦେବୀ ବଲା ହ୍ୟ । ଶୀତଳା ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଧି ଓ ପରିଷକାର-ପରିଚଛନ୍ନତା ବିଷୟେ ସଚେତନ ହ୍ୟେ ଥାକି ।
୩. ଦେବୀ ଶୀତଳାର ଦୁଇ ହାତେ ରଯେଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଷ୍ଠ ଓ ସମ୍ମାର୍ଜନୀ । କଥିତ ଆହେ ସମ୍ମାର୍ଜନୀର ମାଧ୍ୟମେ ତିନି ଅମୃତମ୍ୟ ଶୀତଳ ଜଳ ଛିଟିଯେ ରୋଗ, ତାପ, ଶୋକ ଦୂର କରେ ଶୀତଳ କରେନ । ଆମରାଓ ବସନ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଦେର ସେବା କରେ ତାଦେର ଶୀତଳ କରବ । ଶୀତଳା ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ଏ ଧରନେର ସେବାମୂଳକ କାଜ କରାର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ । କଥନୋ କଥନୋ ତିନି ନିମେର ପାତା ବହନ କରେ ଥାକେନ । ନିମ ବୃକ୍ଷ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଉପ୍ତିଦି । ଆମରା ବାଡ଼ିର ଅଙ୍ଗିନାୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧେର ଜନ୍ୟ ନିମ ଗାଛ ରୋପଣ କରତେ ପାରି ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବର୍ତ୍ତନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । କୋନ୍ ଦେବତାକେ ସଡାନନ ବଲା ହ୍ୟ?

- | | |
|--------------|-----------|
| କ. ଗଣେଶ | ଖ. ଅର୍ଜୁନ |
| ଘ. କାର୍ତ୍ତିକ | ଘ. ଶିବ |

୨ । କୋନ୍ ତିଥିତେ ଶୀତଳା ଦେବୀର ପୂଜା କରା ହ୍ୟ?

- | | |
|-----------|-----------|
| କ. ପଥ୍ମମୀ | ଖ. ଷଷ୍ଠୀ |
| ଘ. ସଞ୍ଚମୀ | ଘ. ଅଷ୍ଟମୀ |

୩ । ଦୁର୍ଗା ମ୍ରାନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହ୍ୟ କୋନ ମିଲିତ ହାନେର ମାଟି -

- i. ତିନ ରାତ୍ରା
- ii. ଦୁଇ ରାତ୍ରା
- iii. ଚାର ରାତ୍ରା

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- | | |
|--------|----------------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଘ. iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ଶୁକ୍ରା ଏ ବଢ଼ର ବୃକ୍ଷମେଲା ଥେକେ ଏକଟି ବେଳ ଗାଛେର ଚାରା କ୍ରମ କରେ ବାଡ଼ିର ଆଙ୍ଗିନାୟ ରୋପଣ କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସଠିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଗାଛଟି ବଡ଼ କରେ ତୋଲେ ।

୪ । ଶୁକ୍ରାର କ୍ରମକୃତ ଗାଛଟି କୋନ ଦେବତାର ସଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ?

- | | |
|---------------|---------|
| କ. କାର୍ତ୍ତିକ | ଖ. ଶିବ |
| ଘ. ବିଶ୍ୱକର୍ମା | ଘ. ଗଣେଶ |

৫। শুক্রার বৃক্ষ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে -

- i. ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা
- ii. বৃক্ষপ্রীতি
- iii. সৌন্দর্য বর্ধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পলাশপুর গ্রামে হঠাতে বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা একত্রিত হয়ে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করে এবং ভক্তিপূর্ণ মনে বিভিন্ন উপচারে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে।

- ক. দেবতা বলতে কী বোঝা?
- খ. সৌক্রিক দেবতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসীরা কোন বিশেষ পূজার আয়োজন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে উক্ত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

ষষ्ठ অধ্যায়

যোগসাধনা

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ‘যোগ’ মানে মিলন। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙে যুক্ত করে সমাধির লাভকে যোগ বলা হয়। যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে বাধলে শরীর ছির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে। আর যোগের মাধ্যমে ইশ্বর আরাধনার প্রতিমাকে যোগসাধনা বলে। ইশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ ও মন উভয়েরই শুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং দেহকে সুস্থ রাখা, মনকে শান্ত রাখা এবং ধর্ম সাধনার জন্য যোগের শুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে যোগসাধনা, অষ্টাঙ্গ যোগ ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী যোগসাধনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্মানুষ্ঠানে যোগসাধনার শুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- অষ্টাঙ্গ যোগের ধারণা ও শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বৃক্ষাসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- অর্ধকূর্মাসনের অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- গরুড়াসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- গরুড়াসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- হ্লাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হ্লাসন অনুশীলন করতে পারব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারব ।

পাঠ ১ : যোগসাধনার ধারণা ও গুরুত্ব

যোগসাধনার ধারণা

‘যোগ’ শব্দটি সাধারণভাবে মিলনের অর্থই ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের মিলন বা একত্রিত হওয়া বা তাদের একত্রিত করাকে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে এর অর্থ আরো গভীরে নিহিত। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধন।

ব্রহ্ম এক হয়েও বহু, নির্গুণ হয়েও সঁণগ, অরূপ হয়েও রূপময়, নৈর্ব্যক্তিক হয়েও ব্যক্তিস্বরূপ, অব্যক্ত হয়েও চরাচরে ব্যক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টার নাম যোগসাধন। তাঁর অস্তিত্বও অনন্ত, চেতনাও অনন্ত, আনন্দও অনন্ত। তিনি বিশ্বময়, আবার তিনি বিশ্বাতীত- সচিদানন্দ। এ ব্রহ্মের সঙ্গে চাই যোগ। সুতরাং যোগের মাধ্যমে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনার প্রক্রিয়াকে যোগসাধনা বলে।

যোগসাধনা মুক্তি লাভের একটি বিশেষ উপায়। মুক্তি লাভের জন্য প্রথমে প্রয়োজন আত্মাপলব্ধির। আর এই আত্মাপলব্ধির জন্য প্রয়োজন শুদ্ধি, স্থির ও প্রশান্ত মন। এজন্য শরীর ও মনকে উপযোগী করতে হয়। তাই শরীর সুগঠিত, সুস্থ ও মনকে নিরুৎসেবে রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তার নামও যোগ। বিশেষভাবে একে হঠযোগ বলে। হঠযোগ হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগের প্রথম সোপান।

যোগসাধনার গুরুত্ব

দেহকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখতে এবং ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। যোগের মাধ্যমে পাচনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠে, যার ফলে শরীর সুস্থ, হালকা এবং স্ফূর্তিদায়ক হয়ে ওঠে। যোগ সাধনা দ্বারা হৃদরোগ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, এ্যালার্জি ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা মেদের পাচন হয়ে শরীরের ওজন কমে এবং শরীর সুস্থ ও সুন্দর হয়। স্তুলকায় মানুষের শরীর ও মন সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য যোগের বিকল্প নেই। যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনের নিগ্রহ হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসের দ্বারা সাধক পরমাত্মা পর্যবেক্ষণ পৌছতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। ব্যাসদেব বলেছেন,- ‘যোগই হলো এক অর্থে সমাধি।’ পুরাকালে মুনিখায়িগণ যোগসাধনার বলেই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেন। যোগাসনের মাধ্যমে তাঁরা নীরোগ থাকতেন ও ধ্যানে, তপ-জগে এবং প্রাণায়ামে নিজেদের দেহ সুস্থ-সবল রাখতেন ও দুষ্ক্ষিণাত্মক মনের অধিকারী হতেন।

যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যোগসাধনায় কেবল যোগ ঐশ্বর্য লাভ করেই তৃপ্ত হন; আবার কেউ কেউ কেউ কর্তৃর তপস্যায় মায়াপাশ ছিন্ন করে পুনরায় যোগশক্তির মাধ্যমে বিশ্বজনের হিতে কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। তাঁরা আত্মসমাহিত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। যোগসাধনাবলে এই আত্মসমাধি ও যোগধারণার সূক্ষ্ম নির্দর্শন সম্পর্কে মহাপ্রাঞ্জ ভীষ্ম বলেছেন, ধনুর্ধারী যোদ্ধারা যেমন অপ্রমত্ত সমাহিত চিত্তে লক্ষ্যভেদ করে তেমনি যোগীরা অনন্যমনে একনিষ্ঠ সাধনায় মোক্ষলাভ করেন। যোগতত্ত্ববিদ মহাত্মারা একাগ্রচিত্তে সংসারের মায়াতরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক করে দুর্লভ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যে যোগী অহিংসাৰ্থ পরায়ণ হয়ে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ করতে পারেন তিনি যোগবলে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ୍ୟ ବଲେଛେନ, ଯୋଗୀରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେ ମନେର ମଧ୍ୟେ ସମାହିତ କରେ ମନକେ ଅହଂକାରେ, ଅହଂକାରକେ ମହତ୍ୱେ, ମହତ୍ୱକେ ପ୍ରକୃତିର ରାଜ୍ୟ ବିଲୀନ କରେ ପରମବ୍ରକ୍ଷେର ଧ୍ୟାନେ ତନ୍ମୟ ହନ । ସେଇ ପରମବ୍ରକ୍ଷେର ଜ୍ୟୋତି ତାଁର ପାପମୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହଦୟେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ତାଁର ଚୋଖେ-ମୁଖେ ପ୍ରତିଭାତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ଓଠେ । ଯୋଗୀ ପୂର୍ବଷ ସତତ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ । ତିନି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାସୁଖତଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତୋ ପ୍ରଶାନ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେର ଅମିଯିସାଗରେ ଭାସେନ । ତିନି ନିର୍ବାତ ନିଙ୍କମ୍ପ ପ୍ରଦୀପେର ମତୋ ହିଂର ଏବଂ ତିନି ଜଗତେର କୋନୋ ଆସନ୍ତି, କୋନୋ ମମତାତେଇ ବିଚଲିତ ହନ ନା । ଦେହ ଅବସାନେ ତିନି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେ ପରମବ୍ରକ୍ଷେ ବିଲୀନ ହନ ।

ଦଳୀଯ କାଜ : ଯୋଗସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଲିଖେ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରସତ୍ତା, ଚରିତାର୍ଥତା, ଗତାନୁଗତିକ, ଚରାଚର, ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ସୁଡୋଲ, ନିଗ୍ରହ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଆତ୍ମସମାହିତ, ତନ୍ମୟ, ଅପ୍ରମାନ୍ତ, ପ୍ରସନ୍ନଚିତ, ପ୍ରଗାଢ଼, ଅମିଯ, ନିର୍ବାତ, ନିଙ୍କମ୍ପ, ବିଲୀନ ।

ପାଠ ୨, ୩ ଓ ୪ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଧାରଣା

ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନେ ସୁଖ ଚାଯ । ଯୋଗସାଧନା ଏମନ ଏକ ପଥ ଯାତେ ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷ ନିର୍ଭୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସଙ୍ଗେ ଚଲତେ ପାରବେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦେର ମାଧ୍ୟମେ କାଟାତେ ପାରବେ । ସେଇ ପଥ ହଚେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପଥ ।

ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଲି ମାନୁଷେର ଆଆନୁସନ୍ଧାନେ ଯୋଗେର ଆଟଟି ଧାପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣ୍ୟାୟମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏହି ଆଟଟି ଯୋଗେର ଅଙ୍ଗ । ଏଗୁଲୋ ଏକତ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବଲେ ପରିଚିତ । ଆମରା ଏଥିନ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପ୍ରତିଟି ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କେ ସଂକ୍ଷେପେ ଆଲୋଚନା କରାଛି :

୧. ଯମ

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେର ପ୍ରଥମ ଧାପ ହଚେ ଯମ । ଯମ ଅର୍ଥ ସଂୟମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନକେ ହିଂସା ଅନୁଭବବାବ ହିତ୍ୟାଦି ଥେକେ ସରିଯେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ କରା । ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତେୟ, ବ୍ରନ୍ଦାଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିହାହ- ଏହି ପାଚ ପ୍ରକାର ଯମ ।

କ. ଅହିଂସା

ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ହଚେ କୋନୋ ପ୍ରାଣୀକେ ମନ, କଥା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ନା ଦେଓଯା । ମନେରେ କାରଣ ଅନିଷ୍ଟ ନା ଭାବା, କାଉକେ କୁଟୁ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ନା ଦେଓଯା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୋନୋ ଅବସ୍ଥାତେ କୋନୋ ସ୍ଥାନେ, କୋନୋ ଦିନ କୋନୋ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା କରା । ଏକ କଥାଯ ଭାଲୋବାସା । ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବେର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ନୟ, ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱେର ପ୍ରତିଟି ବଞ୍ଚିର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ।

খ. সত্য

যেমন দেখেছি, যেমন শুনেছি এবং যেমন জেনেছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে করাকে সত্য বলে। মন যদি সত্য চিন্তা করে, জিহ্বা যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্র জীবন যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

গ. অস্ত্রেয়

অস্ত্রেয় অর্থ চুরি না করা। অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্ত্রেয় (চুরি) বলে। তাই যোগী তাঁর জাগতিক প্রয়োজন সর্বনিম্ন মাত্রায় আবদ্ধ রাখেন। যোগীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর সান্নিধ্য।

ঘ. ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং পবিত্র সংযত জীবনযাপন। জীবনে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি পাওয়া যায়, মনে সাহস পাওয়া যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়। ব্রহ্মচর্যে যোগীর জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, তখন তাঁর ঈশ্বরদর্শন সহজ হয়।

ঙ. অপরিগ্রহ

অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্তু ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

২. নিয়ম

অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় হচ্ছে নিয়ম। মহৰ্ষি পতঞ্জলি শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

ক. শৌচ

শৌচ বলে শুনিকে, পবিত্রতাকে। এই শৌচ দুই প্রকারের হয় : এক বাহ্য এবং দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ। সাধকের প্রতিদিন জল দ্বারা শরীরের শুনি, সত্যাচরণ দ্বারা মনের শুনি, বিদ্যা আর তপ দ্বারা আত্মার শুনি এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুনি করা উচিত।

খ. সন্তোষ

সন্তোষ অর্থ সম্যক তৃষ্ণি। এই সন্তোষ হঠাতে আসে না, একটু একটু করে তাকে মনের মধ্যে জাগাতে হয়। মনে সন্তোষ না থাকলে কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না। যোগীর অভাব বোধ থাকে না, তাই তাঁর মনে কোনো অসন্তোষও থাকে না। তাঁর মনে যে সন্তোষ থাকে তাতে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করেন।

গ. তপ

তপ হচ্ছে কোনো সকলসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা। সেই সাধনায় প্রয়োজন আত্মশুনি, আত্মশাসন ও আত্মসংযম। যোগে তপ বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তিম মিলনের জন্য সচেতন চেষ্টা।

୭. ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ

ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ବେଦ-ଅଧ୍ୟୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଭଗବଦ୍-ବିଷୟକ ଗ୍ରହ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବଲା ଯେତେ ପାରେ । ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ ଥେକେ ଯେବେ ମହାନ ଚିନ୍ତା ଉଡ଼ିବା ହୁଏ ତା ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟୀର ରଙ୍ଗପ୍ରୋତ୍ତ୍ଵରେ ମିଶେ ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନେ ଓ ସଭ୍ୟା ଅଞ୍ଚିତ୍ବୀଭୂତ ହୁଏ ।

୮. ଈଶ୍ୱର-ପ୍ରଣିଧାନ

ପ୍ରଣିଧାନ ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ । ସମନ୍ତ କର୍ମ ଓ ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରେ ଅର୍ପଣ କରାର ନାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ । ଈଶ୍ୱରେ ସବ ଅର୍ପଣ କରଲେ ଅହଂ ବା ଅହଂକାର ନାଶ ହୁଏ । ଈଶ୍ୱରେ ଯାଁର ବିଶ୍ୱାସ ଆଛେ ତାଙ୍କ ଜୀବନେ କଖନରେ ହତାଶା ଆସେ ନା । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତେଜେ ଭରେ ଓଠେ । ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ସମନ୍ତ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରେ ଅର୍ପଣ କରେନ । ତାଇ ତାଙ୍କ ସମନ୍ତ କର୍ମେ ତାଙ୍କ ଭିତରକାର ଦେବତା ଫୁଟେ ଓଠେ ।

୯. ଆସନ

ଆସନ ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସୁଖେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାକା - ସ୍ଥିରସୁଖମ୍ଭାସନମ୍ । ଦେହମନକେ ସୁହୃ ଓ ସ୍ଥିର ରାଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହଭଙ୍ଗ ବା ଦେହବଞ୍ଚାନ ତାକେ ଆସନ ବଲେ । ଆସନେ ଶରୀରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ, ଶରୀର ନୀରୋଗ ଓ ଲୟଭାର ହୁଏ । ଏକଟା ସ୍ଥିର ଓ ସୁଖକର ଭଙ୍ଗିତେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଆସନେ ଶରୀରେ ଓ ମନେ ସମସ୍ୟା ଘଟେ । ଯୋଗୀ ଆସନେ ଦେହକେ ଜୟ କରେ ତାକେ ଆତ୍ମାର ବାହନ ହିସେବେ ଗଡ଼େ ତୋଳେନ । ଆସନ ନାନା ପ୍ରକାର । ସେମନ- ପଦ୍ମାସନ, ସୁଖାସନ, ଗୋମୁଖାସନ, ହଲାସନ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯୋଗୀପୂର୍ବ ନିଜ ଦେହ ଓ ମନକେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଯ ନିବିଷ୍ଟ କରାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେନ । ଯୋଗସାଧନାଯ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନ ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର । ତବେ କୋଣୋ ଗୁରୁ ବା ଯୋଗୀର ନିକଟ ଏହି ଆସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା କରା ଦରକାର ।

୧୦. ପ୍ରାଣାୟାମ

ପ୍ରାଣାୟାମ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣେର ଆୟାମ । ପ୍ରାଣ ହଲୋ ଶ୍ଵାସରୂପେ ଗୃହୀତ ବାଯୁ ଆର ଆୟାମ ହଲୋ ବିଷାର । ସୁତରାଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ବଲତେ ବୋକ୍ଖାଯ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ବିଷାର । ଅର୍ଥାଂ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ସାଭାବିକ ଗତିକେ ନିୟମିତ ଏବଂ ନିଜ ଆୟାମେ ଆନାଇ ପ୍ରାଣାୟାମ । ପ୍ରାଣାୟାମେ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ବିଷାରିତ ଅର୍ଥାଂ ଦୀର୍ଘତର କରା ହୁଏ । କାରଣ, ଯୋଗୀର ଆୟୁ ଦିନଗଣନାଯ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନା, ସ୍ଥିର ହୁଏ ଶ୍ଵାସ ଗଣନାଯ । କତବାର ତିନି ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ତା ଦିଯେଇ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ପରିମାପ କରା ହୁଏ । ଯତ ବେଶି ତିନି ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରବେନ ତତ ବେଶି ତାଙ୍କ ଆୟୁକ୍ଷଯ ହବେ । ସେହି କାରଣେ ତିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀରଭାବେ ଓ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଦଭାବେ ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏହିରକମ ଛନ୍ଦୋବନ୍ଦଭାବେ ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରଲେ ଶ୍ଵସନତତ୍ତ୍ଵ ବଲିଷ୍ଠ ହୁଏ, ମ୍ଲାୟୁତତ୍ତ୍ଵ ଶାନ୍ତ ଥାକେ ଏବଂ କାମନାବାସନା ହ୍ରାସ ପାଇ । ରେଚକ, ପୂରକ ଓ କୁନ୍ତକ-ଏହି ତିନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାୟାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣକେ ବଲେ ପୂରକ, ଶ୍ଵାସତ୍ୟାଗକେ ବଲେ ରେଚକ ଏବଂ ଶ୍ଵାସ ଧାରଣକେ ବଲେ କୁନ୍ତକ । ପ୍ରାଣାୟାମକେ ଏକଧରନେର ବିଜ୍ଞାନ ବଲା ଯେତେ ପାରେ, ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସେର ବିଜ୍ଞାନ । ତବେ ସଦ୍ଗୁରଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟାର ଛାଡ଼ା କଖନରେ ପୂରକ-ରେଚକ-କୁନ୍ତକ ସମସ୍ତିତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରା ଉଚିତ ନାହିଁ ।

୫. ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ଫିରିଯେ ନେଓଯା । ବାହ୍ୟିକ ବିଷୟବସ୍ତ୍ର ଥେକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୂହକେ ଭିତରେ ଦିକେ ଫିରିଯେ ନେଓଯାକେ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଲେ । ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅଭ୍ୟାସେର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରା ଯାଯା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲୋ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହଲେ ଚିତ୍ରେ ବିଷୟ ଆସନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏମତାବଞ୍ଚାୟ ଚିତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିବିଷ୍ଟ ହତେ ପାରେ ।

୬. ଧାରଣା

ମନକେ ବିଶେଷ କୋନୋ ବିଷୟେ ସ୍ଥିର କରା ବା ଆବଦ୍ଧ ରାଖାର ନାମ ଧାରଣା । ଧାରଣା ଅର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା । ଏକାଗ୍ରତା ଛାଡ଼ା ଜଗତେ କିଛୁଇ ଆୟନ୍ତ କରା ଯାଯା ନା । କୋନୋ ବିଷୟ ଆୟନ୍ତ କରତେ ହଲେ ଚିତ୍ତବ୍ୱତ୍ତିକେ ବିଷୟାନ୍ତର ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାତ କରେ ଏହି ବିଷୟେ ସ୍ଥାପନ କରତେ ହୁଏ । ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରତେ ଈଶ୍ୱରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହତେ ହୁଏ । ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହତେ ହଲେ ଏକ-ତତ୍ତ୍ଵ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ହୁଏ । ନିଜ ଦେହେର ଅଙ୍ଗବିଶେଷେ ଯେମନ- ନାଭି, ନାକେର ଅଭାଗ ବା ଜ୍ଞ-ୟଗଲେର ମଧ୍ୟଥାନେ ଅଥବା କୋନୋ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେ କୋନୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ମନକେ ନିବିଷ୍ଟ କରା ଯେତେ ପାରେ । ମନକେ କୋନୋ ବିଷୟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରେ ନିବିଷ୍ଟ ରାଖାର ଅଭ୍ୟାସେର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ଅଭିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୌଛାନୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ । ଧାରଣା ହଚ୍ଛେ ଧ୍ୟାନେର ଭିତ୍ତିସ୍ଵରୂପ ।

୭. ଧ୍ୟାନ

ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ନିରବଚିନ୍ନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା । ମନ ଯଦି ନିରବଚିନ୍ନଭାବେ ଈଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାହଲେ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତନେର ପର ଅନ୍ତମେ ଈଶ୍ୱରୋପମ ହତେ ପାରେ । ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀର ଦେହ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବିଚାରଶକ୍ତି ଅହଂକାର ସବକିଛୁ ଈଶ୍ୱରେ ଲୀନ ହେଁ ଯାଯା ଏବଂ ତିନି ଏମନ ଏକ ସଚେତନ ଅତିନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବଙ୍ଗ୍ରହୀ ପାଞ୍ଚ ଯା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯାଯା ନା । ତଥନ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ା ତାର ଆର କୋନୋ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନା । ତିନି ତାର ଆପନ ଅନ୍ତରେ ଆଲୋଓ ଦେଖିବାରେ ପାନ ।

୮. ସମାଧି

ସମାଧି ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାଗେ ଈଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ତସମର୍ପଣ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାଗେ ଈଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ର ସମର୍ପଣ କରତେ ପାରିଲେ ପରମାତ୍ମାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବାତ୍ମାର ନିବେଶ ଘଟେ, ସାଧକେର ଅନ୍ତେଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଧ୍ୟାନେର ଉତ୍ୟୁକ୍ତ ଶିଖରେ ଉଠେ ସାଧକ ସମାଧି ଲାଭ କରେନ । ତଥନ ତିନି ମନଶୂନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ, ଅହଂଶୂନ୍ୟ ନିରାମୟ ଅବଙ୍ଗ୍ରହୀ ପାଞ୍ଚ ହୁଏ । ତଥନ ପରମାତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ତାର ମିଳନ ଘଟେ । ତଥନ ତାର ‘ଆମି’ ବା ‘ଆମାର’ ଜ୍ଞାନ ଥାକେ ନା, କାରଣ ତଥନ ତାର ଦେହ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତର ଥାକେ । ସାଧକ ତଥନ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଲାଭ କରେନ ।

ପାଠ ୫ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗେର ଶୁରୁତ୍ୱ

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନେ ମାନୁଷେର ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯା । ପ୍ରମତ୍ତା ନଦୀତେ ବୀଧି ଦିଯେ, ଖାଲ ଖନନ କରେ ଯଥନ ତାକେ ସଠିକଭାବେ ବଶେ ଆନା ହୁଏ ତଥନ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳାଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଜଳାଧାରେର ଜଳେ ଫସଲ ଫଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମଦ୍ଦିତେ ଭରେ ଓଠେ । ଠିକ ତେମନି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଯୋଗ ପାଲନ କରେ ଅଶାନ୍ତ ମନକେ ବଶେ ଆନନ୍ଦେ ପାରା ଯାଯା ବିଧାୟ ଶାନ୍ତିର ପାରାବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆତ୍ମୋନ୍ନାଯନେ ଅପରିମୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରା ଯାଯା ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗ ପାଲନ ନା କରେ କୋନୋ ସ୍ଵକ୍ଷିଳେ ଯୋଗୀ ହତେ ପାରେ ନା । ସମ ଏବଂ ନିୟମ ହଚେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଆଧାର । ସମ ଆର ନିୟମେ ସାଧକେର ଭାବ ଆର ଆବେଗ ନିୟମିତ ହୁଏ, ଜଗତେର ଅନ୍ୟସବ ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ଏକଟା ଏକତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଆସନେ ଦେହ ଓ ମନ ସୁଖ ସବଳ ଓ ସତେଜ ହୁଏ, ତଥନ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ଏକଟା ଏକତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଶେଷେ ତାଁର ଦେହସତେନତା ଲୁଣ୍ଡ ହେଁ ଯାଏ । ଦେହକେ ତିନି ଜୟ କରେ ଆଆର ବାହନ ହିସେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେନ । ପ୍ରାଣୟାମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧକେର ଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟମିତ କରେ ତାଁର ମନକେ ବଶେ ଆନେ । ତାତେ ତାଁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୂହ ବୈଷୟିକ ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ଦାସତ୍ୱବଦ୍ଧନ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ସାଧକକେ ତାଁର ଆଆର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶେ ନିୟେ ଯାଏ । ସାଧକ ତଥନ ଈଶ୍ଵରାନୁସନ୍ଧାନେ ସ୍ଵର୍ଗେର ଦିକେ ତାକାନ ନା । ତଥନ ତାଁର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଈଶ୍ଵର ଆଛେନ ତାଁରଇ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରାଆ ନାମେ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ମାନବତା ଏବଂ ବିଜାନେର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରେଇ ନିଜେକେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରରେ । ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଖୁଲୁ, ସଂଘର୍ଷ ସଦି କୋନୋ ଉପାର୍ୟେ ବନ୍ଦ କରତେ ହୁଏ, ତାହଲେ ସୌଟୋ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ମାଧ୍ୟମେଇ ସମ୍ଭବ । ସଦି ପୃଥିବୀର ସବ ଲୋକ ବାସ୍ତବେ ଏଇ ବ୍ୟାପାରଟା ନିୟେ ଏକମତ ହୁଏ ଯେ, ବିଶେ ଶାନ୍ତି ହସିତ ହେଁଯା ଉଚିତ, ତାହଲେ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନଇ ହଚେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଚର୍ଚା । ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେ ଜୀବନେର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାଙ୍ଗଳୋର ଅନୁପମ ସମାବେଶ ରହେଛେ । ସଦି କୋନୋ ସ୍ଵକ୍ଷିଳେ ନିଜେର ଅନ୍ତିତ୍ରେ ଖୋଜ କରେ ଏବଂ ଜୀବନେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହତେ ଚାଯ, ତାହଲେ ତାଁର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ପାଲନ ଅବଶ୍ୟଇ କରା ଉଚିତ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରାଇ ସ୍ଵକ୍ଷିଳିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତା, ଶାରୀରିକ ସୁହୃଦୀ, ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଗରଣ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦେର ଅନୁଭୂତି ହତେ ପାରେ ।

ଏକକ କାଜ : ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗ ପାଲନେର ଉପକାରିତା ଲିଖେ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।

ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ : ପ୍ରତିପାଦିତ, ଆଆକେନ୍ଦ୍ରିତ, ଜାଗତିକ, ସମ୍ୟକ, ଶ୍ୱସନତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟାହାତ, ଈଶ୍ଵରୋପମ, ଲୀନ, ଅନ୍ୟେଷଣ, ଉତ୍ୟୁଙ୍ଗ, ନିରାମୟ, ପ୍ରମତ୍ତା, ପାରାବାର, ଏକତାନ, ବୈଷୟିକ ।

ପାଠ ୬ : ବୃକ୍ଷାସନେର ଧାରଣା, ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଭାବ

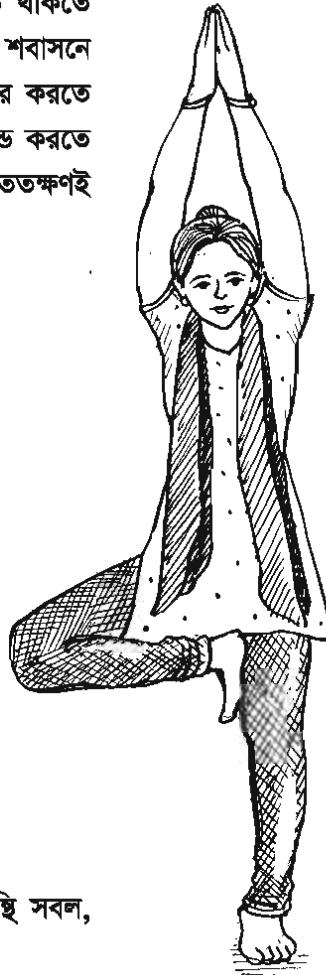
ବୃକ୍ଷାସନେର ଧାରଣା ଓ ପଦ୍ଧତି

ଏହି ଆସନେ ଆସନକାରୀର ଦେହ ବୃକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ହୁଏ ବଲେ, ଏକେ ବୃକ୍ଷାସନ ବଲେ ।

ଦୁଇପା ଜୋଡ଼ା କରେ ସୋଜା ହେଁ ଦାଁଡାତେ ହବେ, ପାଯେର ପାତା ମାଟିତେ ସମାନଭାବେ ଲେଗେ ଥାକବେ । ଏବାର ଡାନ ପା ହାଁଟୁତେ ଭେଙେ ଗୋଡ଼ାଲି ବାଁ ଉର୍କମୂଲେ ରାଖତେ ହବେ, ପାଯେର ପାତା ଉର୍କର ସଙ୍ଗେ ଲେଗେ ଥାକବେ, ପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗଳେ ଥାକବେ ନିଚେର ଦିକେ ଫେରାନୋ । ଏଥନ କେବଳ ବାଁ ପାଯେର ଉପର ଭର ଦିଯେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକତେ ହବେ । ଏବାର ନମକାରେର ଭଞ୍ଜିତେ ହାତେର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଜୋଡ଼ା କରେ ବୁକେର କାଛେ ଆନତେ ହବେ, ତାରପର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଜୋଡ଼ା ରେଖେ ହାତ ଦୁଇଟି ସୋଜା ମାଥାର ଉପର ନିତେ ହବେ । ଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଵାଭାବିକ ରେଖେ ଏହିଭାବେ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ ୧୦ ମେଟେ ଥାକତେ ହବେ । ପରେ ହାତ ନାମିଯେ ହାତେର ତାଲୁ ଦୁଇଟି ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଡାନ ପା ସୋଜା କରେ ଆବାର ଆଗେର ମତୋ ଦୁପାଯେ ସୋଜା ହେଁ ଦାଁଡାତେ ହବେ । ଏବାର ଠିକ ଏକଇଭାବେ ଡାନ ପାଯେ ଦାଁଡିଯେ ବାଁ ପା ହାଁଟୁତେ ଭେଙେ ଗୋଡ଼ାଲି ଡାନ ଉର୍କମୂଲେ ରାଖତେ ହବେ ।

এবারও খাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুইপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শ্বাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এই হলো একবার। এই রকম তিনবার করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যন্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। বাঁ পায়ে যতক্ষণ করা হবে তান পায়েও ততক্ষণ করতে হবে এবং ততক্ষণই শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : বৃক্ষাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।



প্রভাব

বৃক্ষাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে -

১. শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাঢ়ে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাঢ়ে।
৪. উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কন্টই, বগল সমস্ত ম্লায়ুত্ত্বীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল, নমনীয় হয়।
৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনোদিন বাত হতে পারে না।
- ৯। ঘাঁটের হাত-পা কাঁপে, পা দুর্বল তাঁদের খুব উপকার হয়।
- ১০। রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরকান বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনীতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে, যাকে অ্যাথেরোমা বলে, তা রোধ হয়। ফলে প্রমোসিস হতে পারে না।

একক কাজ : বৃক্ষাসন অনুশীলনের পাঁচটি উপকারিতা লেখ।

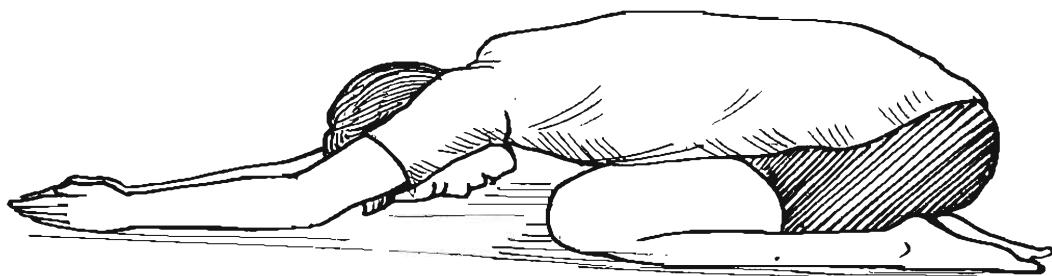
নতুন শব্দ : বৃক্ষাসন, দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা, ম্লায়ুত্ত্বী, গ্রন্থি, কোলেস্টেরল, ধমনী, অ্যাথেরোমা, প্রমোসিস

পাঠ ৭ : অর্ধকূর্মাসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

অর্ধকূর্মাসনের ধারণা ও পদ্ধতি

'কূর্ম' অর্থ কচ্ছপ। এই আসনে আসনকারীর দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলে। হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া থাকবে, নিতৰ থাকবে গোড়ালির উপর। পায়ের তলা উপর দিকে ফেরানো থাকবে। হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে।

নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে এক হাতের বুঢ়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুঢ়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে। হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। তখন দেখাবে একটা মন্দিরের চূড়ার মতো। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্চাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রশাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতৰ গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হাঙ্কা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিচল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিঃশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এইভাবে তিনবার করতে হবে। উচ্চরক্ষচাপ আছে এমন রোগীদের এই আসন করা নিষেধ।



প্রভাব

অর্ধকূর্মাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে-

১. শরীর অনেক শিথিল হয়।
২. মেরুদণ্ড সতেজ হয়।
৩. পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়।
৪. আসনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্থান্ত্য লাভ করে।
৫. মস্তিষ্ক শান্ত হয়।
৬. যকৃৎ ভালো থাকে।
৭. অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয়।
৮. হজম শক্তি বাড়ে।

৯. পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে ।
১০. হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয় ।
১১. পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে ।
১২. কাঁধের পেশির ব্যথা ভাঙ্গে হয় ।
১৩. পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে ।
১৪. পেট ও উরুর পেশি সবল হয় ।
১৫. ঘন অনেক ধীর, ছির ও শান্ত হয় এবং সুর্খ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে ।
১৬. ভাবাবেগ, ভয়-ভীতি আর ক্ষেত্র আলগা হয় ।
১৭. আসনকারীকে আস্তে আস্তে দৃঢ়-যত্নগা থেকে মুক্ত করে, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন করে ।
১৮. যোগীকে তাঁর যোগ সাধনায় মনোনিবেশের জন্য প্রস্তুত করে ।

দলীল কাজ : অর্ধকূর্মাসনের উপকারিতা লিখে পোস্টার তৈরি কর ।

নতুন শব্দ : কূর্ম, শিথিল, অঙ্গীর্ণ, অবল, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিতম্ব, পাঁজর, প্রকোপ, যকৃৎ ।

পাঠ ৮ ও ৯ : গরুড়াসনের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রভাব

গরুড়াসনের ধারণা ও পদ্ধতি

এই আসনে দেহভঙ্গী গরুড়-এর মতো হয় । তাই এর নাম গরুড়াসন ।

দুইপা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে । ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে । এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে । তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে । এ অবস্থানে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে । হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে ।

একক কাজ : গরুড়াসন অনুশীলন করে দেখাও ।

প্রভাব

গরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে-

১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় ।
২. পায়ে বাত হতে পারে না ।
৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না ।



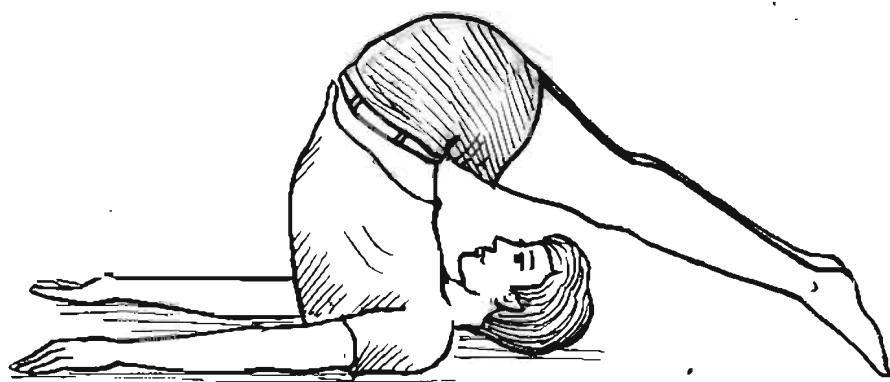
୪. ଉର୍କ, ନିତସ୍ବ, ପେଟ ଆର ହାତେର ଉପରେର ଦିକ ମଜ୍ବୁତ ହୁଁ ।
୫. ନିତସ୍ବ, ହାତୁ ଆର ଗୋଡ଼ାଲିର ଗୌଡ଼େର ନମନୀୟତା ବାଢ଼େ ।
୬. କାଂଧ ଶକ୍ତ ହୁଁ ଗିମ୍ବେ ଥାକଲେ ତା ଭାଲୋ ହୁଁ ।
୭. ବାକା ମେରମନ୍ଦଗୁ ସୋଜା ହୁଁ ।
୮. ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗା କରା ସହଜ ହୁଁ ।
୯. ଦେହ ଲମ୍ବା ହୁଁ ।
୧୦. ଦେହେର ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ଥାକେ ।
୧୧. କିଡନି ଭାଲୋ ଥାକେ ।

ଦୟାରୀ କାଙ୍ଗ : ଗର୍ଭାସନେର ଉପକାରିତାଗଲୋ ଲେଖ ।

ହଳାସନେର ଧାରণା, ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭିଵାଦ

ହଳାସନେର ଧାରণା ଓ ପରିପ୍ରକାଶ

'ହଳ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲାଙ୍ଘନ । ଏହି ଆସନେ ଦେହଭକ୍ଷି ଅନେକଟା ହଲେର ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଙ୍ଘନେର ମତୋ ଦେଖାଯ ବଲେ ଏକେ ହଳାସନ ବଲେ ।



ପା ଦୂଟୋ ସୋଜା କରେ ଚିଂ ହୁଁ ଶେଷେ ପଡ଼ନ୍ତେ ହୁଁ । ଉର୍କ, ହାତୁ ଓ ପାରେର ପାତା ଜୋଡ଼ା ଥାକବେ । ହାତ ଦୂଟୋ ସୋଜା କରେ ଶରୀରେର ଦୁ ପାଶେ ରାଖନ୍ତେ ହୁଁ । ଏବାର ନିଃଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ପା ଦୂଟୋ ଜୋଡ଼ା ଓ ସୋଜା ଅବସ୍ଥା ଆଣେ ଆଣେ ଉପରେ ତୁଳନ୍ତେ ହୁଁ ଏବଂ ମାଥାର ପେଛନେ ଯତଦୂର ସନ୍ତୁବ ଦୂରେ ନିତେ ହୁଁ ଯେନ ପାରେର ଆକ୍ରମଣଗଲୋ ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ ପାରେ । ଶବ୍ଦ-ପ୍ରଶବ୍ଦ ସାଭାବିକ ରେଖେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତି ଓ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ରାମ ହୁଁ । ଏବଂ ଆଣେ ଆଣେ ପା ନାମିଯେ ଆଗେର ଅବସ୍ଥା ଫିରେ ଯେତେ ହୁଁ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ରାମ ଶାନ୍ତି ଓ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ରାମ ହୁଁ ।

নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিনবার অনুশীলন করতে হবে। যাদের আমাশয়, হদরোগ, উচ্চরক্তচাপ আছে এবং যাদের পীহা, যকৃৎ অস্থাভাবিক বড় তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

একক কাজ : হলাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব

হলাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে -

১. মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও নমনীয় করে তোলে।
২. মেরুদণ্ডের স্থিতি-স্থাপকতা বজায় থাকে।
৩. মেরুদণ্ড সংলগ্ন ম্যায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৪. কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়।
৫. পীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৬. থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল প্রভৃতি গ্রস্থি সবল ও সক্রিয় হয়।
৭. পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমিয়ে দেহকে সুষ্ঠাম ও সুন্দর করে গড়ে তোলে।
৮. ডায়াবেটিস, বাত বা সায়টিকা কোনো দিন হতে পারে না।
৯. পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়।
১০. যাদের কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে তাদের উপকার হয়।

নতুন শব্দ : হল, পীহা, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, কোষ্ঠবদ্ধতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'যোগই হলো আধ্যাত্মিক কামধেনু' – কে বলেছেন?

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ক. ব্যাসদেব | খ. ডষ্টর সম্পূর্ণানন্দ |
| গ. মহর্ষি পতঞ্জলি | ঘ. মহর্ষি যাজ্ঞবক্ষ্য |

২। অন্তেয় অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. সম্যক তৃষ্ণি | খ. নিজেকে জানা |
| গ. একাগ্রতা | ঘ. চুরি না করা |

৩। কোনটি ধ্যানের ভিত্তি স্বরূপ?

- | | |
|----------|---------------|
| ক. নিয়ম | খ. আসন |
| গ. ধারণা | ঘ. প্রত্যাহার |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ୪ ଓ ୫ ନଂ ଥିଲେର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ନବମ ଶ୍ରେଣିର ଛାତ୍ର ସୌରଭ ସହଜ-ସରଳ ଓ ସଦାଲାପୀ । ସେ କଥନୋ କାଉକେ କୃତ୍ତ କଥା ବଲେ ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟେର କ୍ଷତିର ଚିନ୍ତା କରେ ନା । ଏମନକି ବିଡ଼ାଳ ଏସେ ଟେବିଲେ ରାଖା ତାର ଗ୍ରାସେର ଦୁଧଟୁକୁ ପାନ କରତେ ଥାକଲେ ସେ ରାଗ କରେ ନା । ବରଂ ଆଦର କରେ ବିଡ଼ାଳଟିକେ ବାକି ଦୁଧଟୁକୁ ପାନ କରାଯା ।

୪ । ସୌରଭେର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯମେର କୋନଟି ଲଙ୍ଘନୀୟ ?

- | | |
|-----------|-----------------|
| କ. ଅନ୍ତେଯ | ଖ. ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟ |
| ଗ. ଅହିଂସା | ଘ. ଅପରିଗ୍ରହ |

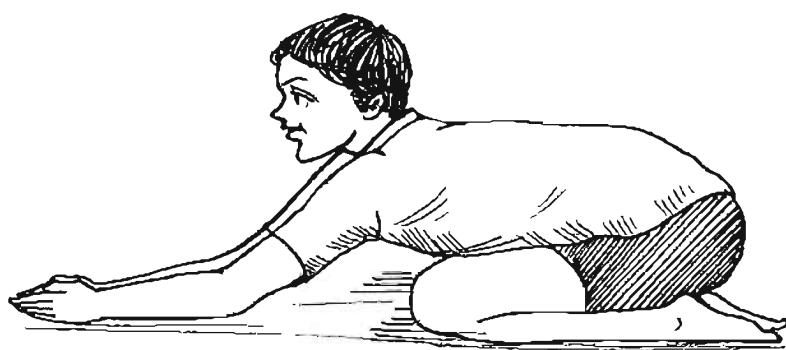
୫ । ଯମେର ଉତ୍ତ ଶ୍ଵରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । କାରଣ ଏଇ ଦ୍ୱାରା -

- ଆତ୍ମୋନୟନ ଘଟେ
- ସମାଜେର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ଥାକେ
- ବିଶ୍ୱେର ପ୍ରତିଟି ବନ୍ତର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ଜାହାତ ହୁଏ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- | | |
|-------------|----------------|
| କ. i | ଖ. i ଓ ii |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ସୂର୍ଯ୍ୟନଶୀଳ ଧ୍ୟାନ :



- ଯୋଗେର ମଧ୍ୟମେ ଦେଖିର ଆରାଧନାର ପ୍ରକିମ୍ବାକେ କୀ ବଲେ ?
- ଅଟ୍ଟାଙ୍ଗ୍ୟୋଗେର ଏକଟି ଧାପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଯୋଗାସନଟିତେ କୀ ହୃଦି ରମେଛେ ତା ନିର୍ମଳ କର ।
- ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁହତା ଆନନ୍ଦନେ ଚିତ୍ରେର ଆସନଟିର ସଠିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ- ବିଶ୍ୱେଷଣ କର ।

সন্তম অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম শব্দটির অর্থ, ‘যা ধারণ করে’। ধৃ ধাতু + মন् (প্রত্যয়) = ধর্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা হ্রদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। মানবজীবনের ইহলোকিক ও পারলোকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আধ্যাত্ম-উপাধ্যান যে-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতিও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে। আর এজন্যই মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করা ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে।



ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মচার, ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মানুষ্ঠান অনুকরণীয় উপাধ্যান প্রভৃতি সরিবেশিত থাকে। কাজেই আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এই ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি। এ অধ্যায়ে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উপনিষদের শুরুত্ব ও শিক্ষা, উপনিষদ থেকে একটি উপদেশমূলক উপাধ্যান ও তার শিক্ষা উপস্থাপন করব। একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের শুরুত্ব ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ হিসেবে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে উপনিষদের শুরুত্ব ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- উপনিষদের একটি উপাধ্যান ও এর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- রামায়ণ-মহাভারতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে উন্নত হব।

পাঠ ১ : আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা

মানুষ জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতে সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের লক্ষজ্ঞান হাজার হাজার বৎসর ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। তারপর লিপি আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে এ সমস্ত জ্ঞান প্রস্থাকারে সম্প্রবেশিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষের কল্যাণে ঐশ্বরিক তত্ত্ব, ইহলোক ও পরলোকের কথা, শ্রেয় ও প্রেয়র কথা, নানা আখ্যান ও উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-রাজবংশের কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানা রহস্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ।

এর পূর্বে আমরা ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হয়েছি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য জেনেছি। আমাদের সকলেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই, সে পশুর সমান। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও পৰিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। এ কল্যাণবোধই ধর্ম। আমরা জানি, মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়েছে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ-

‘বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মানঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাচ্ছঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥’ (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালক্ষ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে।

একক কাজ : ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? লেখ।

মনুসংহিতায় ধর্মের আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে :

‘ধৃতিঃ ক্ষমা দমোৎস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।’

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংয়ম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সব কিছুর মূলে ঈশ্বর। সুতরাং ধর্মের মূলও ঈশ্বরকে ভক্তি করা ধর্মের মূল কথা। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলা সকলেরই কর্তব্য। যা ধর্মের বিপরীত তাই অধর্ম। যেমন চুরি না করা ধর্ম। সুতরাং চুরি করা অধর্ম। অতএব চুরি করা উচিত নয়। কারণ এতে অধর্ম হয়। অধর্ম নৈতিকতা-বিরোধী। ধর্ম নৈতিক শিক্ষার সহায়ক।

১০
১১ উপরের আলোচনা থেকে আমরা ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছি এ সমস্ত কিছুই ধর্মগ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে

দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম কীভাবে পরাজিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে কী করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নেতৃত্ব উন্নতি হবে। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে কীভাবে মানুষ নিজের ধৰ্মস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নেতৃত্বক গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমরা আমাদের জীবনকে নেতৃত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলব। এভাবেই আমাদের সমাজ তথা জাতি ও দেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

একক কাজ : ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তা লেখ।

পাঠ ২ : উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমরা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচঙ্গী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পরিচয় জেনেছি। এবার আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করব।

উপনিষদ

‘বেদ’ একটি বিশাল জ্ঞানভাগ। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি, যা দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নির্ত্তা, সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাবত হয়েছে। মনুসংহিতায় লিখিত হয়েছে, ‘বেদঃ অখিলধর্মমূলম্’- অর্থাৎ ‘বেদ ধর্মের মূল।’

বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারম্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। যেমন- (১) মন্ত্র বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। এ রচনা সমষ্টিকে দুইটি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা- (ক) কর্মকাণ্ড ও (খ) জ্ঞান কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, আচার-নিয়ম পালনের নির্দেশনা। আর জ্ঞান কাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞান কাণ্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়। উপ-নি-সদ যোগে ক্রিপ্ত=উপনিষদ্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ‘উপ’ অর্থ-সমীক্ষে, নি’ অর্থাৎ নিশ্চয়ের সাথে, সদ অর্থাৎ বিনষ্ট করা, সুতরাং সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সাথে যে গুহ্যবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাই উপনিষদ। উপনিষদ সম্পর্কে অন্যরূপ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেমন- জনসাধারণ যেখানে চারদিকে (পরি) বসে (সদ) তাকে বলে পরিষদ; এভাবে লোকেরা যেখানে একসঙ্গে (সম) বসে (সদ) তাকে বলে সংসদ। অনুরূপভাবে শিষ্যগণ গুরুর নিকট (উপ) গিয়ে যেখানে বসতেন (নি-সদ) মূলত সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ। কালক্রমে এসব বৈঠকে বা উপনিষদে যে বিদ্যার অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হতো তারও নাম হয় উপনিষদ। এরপর যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হলো তার নামও হলো উপনিষদ।

ଉପନିଷଦେର ଆରା ଏକଟି ଅର୍ଥ ହଲୋ ରହସ୍ୟ । ଅତିଶ୍ୟ ଗଭୀର ଏବଂ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ବଳେ ଏହି ଉପନିଷଦ ବା ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟାକେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାର ନ୍ୟାଯ ଯତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସକଳେର ନିକଟ ପ୍ରକାଶ କରା ହତୋ ନା ତାଇ ଏହି ଏକ ନାମ ରହସ୍ୟ । ଏଜନ୍ ଉପନିଷଦ ଓ ରହସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦୁଟି ସମାର୍ଥକ ହୁୟେ ପଡ଼େ । ଜଗତେର ସର୍ବକାଳେର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବନାର ଚରମରଂଗ ଏହି ଉପନିଷଦ । ପ୍ରତିଟି ବେଦେର ପୃଥିକ ପୃଥିକ ଉପନିଷଦ ବିଦ୍ୟମାନ । ଉପନିଷଦେର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଶତାଧିକ । ଏହି ମଧ୍ୟେ ବାରଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନିଷଦ । ସେଗୁଲୋ ହଲୋ- ଐତରେୟ, କୌଷିତକି, ବୃଦ୍ଧାରଣ୍ୟକ, ଦୀଶ, ତୈତିରୀଯ, କଠ, ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତର, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, କେଳ, ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ ଓ ମାଘୁକ୍ୟ । ଏହି ମଧ୍ୟେ ମାଧୁକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟଗୁଲୋ ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ କର୍ତ୍ତକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଯେଛେ ବିଧାଯ ଏଗୁଲୋକେ ପ୍ରଧାନ ଉପନିଷଦ ବଲା ହୁଯ ।

ଏକକ କାଜ : ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କେ ତିନାଟି କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ।

ପାଠ ୩ : ଉପନିଷଦେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଶିକ୍ଷା

ଆଗେଇ ବଲେଛି, ବେଦେର ଦୁଟି କାଣ୍ଡ । ଯଥା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ । ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡେର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କାରାଓ କାରାଓ ଯତେ, ବେଦେର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଶେଷ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବା ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତେ ସଂଗୃହୀତ, ସେଜନ୍ୟ ଏହି ବେଦାନ୍ତ । ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟାଇ ବେଦେର ସାର, ଏଜନ୍ ଏର ନାମ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଅଜାନ ନିବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ରକ୍ଷପ୍ରାଣ୍ତିର ଉପାୟ ବଳେ ଏହି ଅପର ନାମ ହେଯେଛେ ଉପନିଷଦ । ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜାନକେ ନାଶ କରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜୀବକେ ପରମବ୍ରକ୍ଷେର ନିକଟେ ନିଯେ ଯାଯ । ପରମବ୍ରକ୍ଷପ୍ରାଣ୍ତି ସାଧନ ବା ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ରହେଛେ ଏ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରହସମୂହେ ।

ଉପନିଷଦ ବା ବେଦାନ୍ତ ରହସ୍ୟାବୃତ ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟାର ଶାସ୍ତ୍ର । ଯାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତେ ବ୍ରକ୍ଷନିଷ୍ଠ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ବ୍ରତୀ ହନ, ଏକମାତ୍ର ତାଁରାଇ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵକେ ଅନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପାରେନ । ଉପନିଷଦଗୁଲୋ ସାଧାରଣତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକେର ଅଂଶ, ତବେ ଇଶୋପନିଷଦଟି ସଂହିତାର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ । ତାଇ ଏହି ଏହି କେବଳ ସଂହିତାପନିଷଦ ବଲା ହୁଯ; ଆର ଅନ୍ୟଗୁଲୋକେ ବଲା ହୁଯ ବ୍ରକ୍ଷୋପନିଷଦ ।

ସାଂସାରିକ ଜୀବନେର ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପ୍ରତି ବୀତମ୍ପ୍ରତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ଦୀନୀନ ଏକଶ୍ରେଣିର ଲୋକ ଜୀବନେର ପ୍ରକୃତ ଗୃଢ଼ ଅର୍ଥ ନିର୍ଧାରଣେ ଉତ୍ସୁକ ହେଯେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଅରଣ୍ୟେ ବସେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ-ଧାରଣା କରତେନ, ତାଁଦେର ଚିନ୍ତାପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍କିଞ୍ଜଳୋଇ ଉପନିଷଦେ ସ୍ଥାନ ପେଯେଛେ । ତାଁଦେର ଶିଷ୍ୟ-ପ୍ରଶିଷ୍ୟେରା ତାଁଦେର ପାଦପ୍ରାପ୍ତେ ବସେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରତେନ ଏବଂ ନିଜେରାଓ ଗୁରୁର ନିକଟ ଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନେର ଓ ସାଧନାର ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରେନ ।

ଉପନିଷଦେର ଶିକ୍ଷା ମାନୁଷକେ ଜୀବନ ବିମୁଖ କରେ ନା, ବରଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନେର କଥା ବଳେ, ଯେ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମେର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରକ୍ଷେର ସାଥେ ସର୍ବଦାଇ ଯୁକ୍ତ । ବ୍ରକ୍ଷଇ ସତ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରକ୍ଷ ଛାଡ଼ା କିଛୁଇ ନାହିଁ । ଜଗତେର ସରକିଛୁଇ ବ୍ରକ୍ଷମଯ ଉପନିଷଦେର ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଥେକେ ବଲା ହୁଯ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରକ୍ଷାତ୍ମେର ଯା କିଛୁ ଆଛେ ସବହି ଏକ । କାରୋ ସାଥେ କାରୋ କୋଣୋ ଭେଦ ନେଇ । ସୁତରାଂ କେଉଁ କାଉଁକେ ହିଂସା କରା ମାନେ ନିଜେକେଇ ହିଂସା କରା । କାରୋ କ୍ଷତି କରା ମାନେ ନିଜେରାଇ କ୍ଷତି କରା । ଅତଏବ ଆମାଦେର ସକଳେରଇ ଉଚିତ ଏକେ ଅପରକେ ହିଂସା ନା କରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହ୍ୟୋଗିତା କରା । ସକଳକେ ନିଜେର ମତୋ କରେ ଦେଖା । ଆର ଏଭାବେଇ

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

একক কাজ : সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে উঠতে পারে তোমার ভাবনার আলোকে একটি পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ ৪ : উপাধ্যান

আরংণি- শ্঵েতকেতু সংবাদ

পুরাকালে আরংণি নামে মহাজ্ঞানী এক খৰি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। শ্বেতকেতুর যখন বার বছর বয়স হলো তখন খৰি আরংণি তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বার বছর গুরুগৃহে থেকে শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে অহংকারী, অবিনীত ও পণ্ডিত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন। পিতা তাকে বললেন, ‘শ্বেতকেতু, তুমি ত মহামনা, পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসেছ। কিন্তু তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যাতে অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়?’ শ্বেতকেতু বললেন, ‘ভগবান, কি সেই উপদেশ?’ পিতা বললেন, ‘হে সৌম্য! একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলেই সমস্ত মৃন্য বস্তু সম্পর্কে জানা যায়। কারণ একটা ঘট একটা সরা, ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকার মাত্র। ভাষা দ্বারা পার্থক্য না করলে সবই মৃত্তিকা। অনুরূপ একটি সুবর্ণপিণ্ডকে জানলেই সকল সুবর্ণময় বস্তুকে জানা যায়। কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি সুবর্ণের বিকার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণই সত্য। এসবই মৃত্তিকার বা সুবর্ণের বিকার ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্তিকা বা সুবর্ণই সত্য। তেমনি হে শ্বেতকেতু, সেই উপদেশ শ্রবণ করলে অশ্রুত বিষয় শোনা হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়।’ শ্বেতকেতু বললেন, ‘পূজনীয় উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। যদি অবগত হতেন, তবে বললেন না কেন?’

সুতরাং আপনি আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিন।’ আরংণি বললেন, ‘হে সৌম্য, তা-ই হোক।’ আরংণি বলতে লাগলেন— শোন, এ জগৎ পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎকর্মপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, ‘বহু স্যাম’ অর্থাৎ বহু হব। তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। তেজ থেকে জল উৎপন্ন হলো। জল থেকে অন্ন সৃষ্টি হলো। এজন্যই যেখানে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বহু অন্ন জন্মে। অন্ন থেকে মন, জল থেকে প্রাণ এবং তেজ থেকে বাক-এর উৎপত্তি। শ্বেতকেতু বললেন,— ‘আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন।’ আরংণি বললেন, ‘শোন, পুরুষ ঘোলকলা যুক্ত। পনের দিন ভোজন করো না, কিন্তু যতটা ইচ্ছা জল পান করো, কারণ প্রাণ জলময়। জলপান করলে প্রাণ বিয়োগ হয় না।’



ଶ୍ଵେତକେତୁ ପନେର ଦିନ ଭୋଜନ କରିଲେନ ନା । ତାରପର ପିତାର ନିକଟ ଗିଯେ ବଲିଲେନ, ‘ପିତା, ଆମି କି ବଲବ?’ ପିତା ବଲିଲେନ, ‘ଝକ, ସଜୁ ଓ ସାମ ଯତ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ।’ ଶ୍ଵେତକେତୁ ବଲିଲେନ, ‘ଏ ସବ ଆମାର ମନେ ଆସିଛେ ନା ।’ ଆକୁଣି ବଲିଲେନ,- ‘ସୌମ୍ୟ ପନେର ଦିନ ଅନାହାରେ ଥେକେ ତୋମାର ଘୋଲଟି କଳାର ମାତ୍ର ଏକଟି କଳା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଛେ । ଏଇ ଦ୍ୱାରା ବେଦ ସମୂହ ବୁଝାତେ ପାରଇ ନା । ତୁମି ଆହାର କର । ପରେ ଆମାର କଥା ବୁଝାତେ ପାରବେ ।’

ଶ୍ଵେତକେତୁ ଭୋଜନ କରି ପିତାର ନିକଟ ଗେଲେନ । ପିତା ତାକେ ବା କିଛି ବଲିଲେନ, ତିନି ସେ ସବହି ଆନାହାସେ ବୁଝାଲେନ । ତିନି ବଲିଲେନ, ହେ ସୌମ୍ୟ, ଜଳ ଡିଲ୍ ଦେହେର ମୂଳ କୋଥାଯା ? ଜଳଙ୍ଗପ ଅକ୍ଷୁରଧାରା କାରଣଙ୍ଗପ ତେଜକେ ଅସେଧନ କର । ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ଏ ସବହି ସଂ ଥେକେ ଉଂପନ୍ନ, ସଂ-ଏ ଆଶ୍ରିତ ଓ ସଂ-ଏ ଶୀନ ହୁଏ । ଏହି ସଂ ବନ୍ଧୁହି ଆଆଁ ।

ଶ୍ଵେତକେତୁ ବଲିଲେନ, ‘ହେ ପିତା, ବୁଝାତେ ପାରିଲାମ ନା ।’

ଆକୁଣି ବଲିଲେନ, ‘ହେ ସୌମ୍ୟ, ଏ ଆଆକେ ଜାନତେ ପାରିଲେଇ ବ୍ରଦ୍ଧାକେ ଜାନା ଯାଇ । କାରଣ, ‘ସର୍ବ ଖର୍ଦ୍ଦିଦଂ ବ୍ରଦ୍ଧା’- ଅର୍ଥାତ୍ ସବ କିଛିଇ ବ୍ରଦ୍ଧାମ୍ୟ ।’

ଶ୍ଵେତକେତୁ ବଲିଲେନ, ‘ତାହାଲେ ଆପଣି କେ ?’

ଆକୁଣି ବଲିଲେନ, ‘ବ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୟ- ଅର୍ଥାତ୍ ଆମି ବ୍ରଦ୍ଧା ।’

୧୦ ଶ୍ଵେତକେତୁ - ତାହାଲେ, ଆମି କେ ?

আরঞ্জি- ‘তত্ত্বমসি অর্থাং তুমিই সেই (ব্রহ্ম)।’

শ্বেতকেতু- যদি আমি, আপনি এবং জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় তাহলে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন? তখন আরঞ্জি শ্বেতকেতুকে এক গ্লাস জলে এক চামচ লবণ রেখে পরের দিন আসতে বললেন। শ্বেতকেতু তাই করলেন। পরের দিন সকালে আরঞ্জি শ্বেতকেতুকে বললেন, ‘কাল যে লবণ রেখেছিলে, তা আন।’ শ্বেতকেতু লবণ খুঁজে পেলেন না। আরঞ্জি শ্বেতকেতুকে বললেন, গ্লাস থেকে জল পান কর। শ্বেতকেতু জলপান করলেন।

আরঞ্জি বললেন, ‘কি রকম?’

শ্বেতকেতু বললেন, ‘লবণাঙ্গ।’

আরঞ্জি বললেন, ‘হে শ্বেতকেতু, লবণ জলে লীন হয়ে আছে; তাই দেখা যায় না। কিন্তু সর্বদা জলের সর্বত্র বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম সর্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান, তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু জানা যায়। এ ব্রহ্মই জানার বিষয়। তিনিই সৎ, তিনিই আত্ম। আর এই ব্রহ্মকে জানা মানে আত্মাকে জানা, নিজেকে জানা। এটাই প্রকৃত জ্ঞান।’

উপাখ্যানের শিক্ষা

‘জগতের সব কিছুই ব্রহ্মময়’ উপনিষদের এ উপলক্ষ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবকিছুকে ব্রহ্মজ্ঞান করা উপনিষদের শিক্ষা। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করেন। তাই কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই; কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে ব্রহ্মের ক্ষতি করা। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

পাঠ ৫ : ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা

রামায়ণ আদি কবি বাল্যাকী মুনি রচিত। রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃতিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। এ সকল আধ্যাত্মিক ও উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উত্তুক্ষ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়।

কৃতিবাসের রামায়ণে রঘুকর দস্যুর কাহিনি থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে, সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই তার ভাগীদার হবে না। দস্যু রঘুকর ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করে একজন ঝুঁঁতি পরিণত হন। শুধু উপদেশ প্রদানই নয়, গ্রহণ করার মানসিকতাও শুরুত্বপূর্ণ। এ কাহিনিটি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উত্তুক্ষ করে। সুতরাং আমাদের

ଉଚିତ ସଦୀ ସଂପଥେ ଚଳା, ସତ୍ୟ କଥା ବଲା, ମାନୁଷେର ସାଥେ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରା, କାଉକେ ଦୁଃଖ ନା ଦେବା । ଧର୍ମଗ୍ରହଣମୁହଁ ମାନୁଷେର ଯାତେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହସ୍ତ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଡ଼େ ଓଠେ, ଏ ସବ କଥାଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହସ୍ତେଛେ । ରାମାୟଣେ ରହେଇ ଶିତାର ପ୍ରତି ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର କଥା, ଆତ୍ମପ୍ରେସ୍, ପତିଶ୍ରେମେର ପରାକାର୍ତ୍ତା, ଦେଶପ୍ରେସେ ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରଜାର ପ୍ରତି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାତାର ପ୍ରତି କନିଷ୍ଠ ଭାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ । ସେମନ- ରାଜା ଦଶରଥେର ସତ୍ୟରଙ୍ଗକ କରାତେ ରାମେର ରାଜ୍ଞୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ଚୌଦ୍ଦ ବନସରେର ଜଳ୍ୟ ବନବାସେ ଗମନ । ରାମେର ସାଥେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ବନବାସ ଗମନ- ପତିଶ୍ରେମେର ପରାକାର୍ତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରେସେର ଜ୍ଞାନାତ୍ମ ଉଦାହରଣ ।

ବନବାସେର କାଳେ ଲଙ୍ଘାର ରାଜା ରାବଣ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ସୀତା ହରଣ ଏବଂ ରାମ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଲଙ୍ଘା ଆକ୍ରମଣ ଓ ରାବଣକେ ସବହଶେ ନିଧନ କରେ ସୀତାକେ ଉଜ୍ଜାର କରା ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ ଓ ଶିଷ୍ଟେର ପାଲନ ଏବଂ ସତ୍ୟେର ଜୟରେଇ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତେଛେ । ଯାତା କୈକେଲୀର ଆଚରଣେ ଭରତ କୁକୁ ହସ୍ତେ ବ୍ୟାପାଇ ରାମକେ ଫିରିଯେ ଆନତେ ବନେ ଗମନ କରେନ । ରାମ ଫିରେ ନା ଏବେ ଭରତ ତାର ପାଦୁକା ନିର୍ବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଫିରେ ଆସେନ ଏବଂ ରାମେର ନାମେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେନ । ଭରତ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତେ ଓ ଡୋଗବିଳାସେ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରେନ ନି । ରାଜସିଂହାସନେ ବସେଓ ବ୍ୟାପାଇୟେର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସାର ବଶବତ୍ତୀ ହସ୍ତେ ବନବାସୀର ମତୋ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରେଛେ । ଭରତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣେର ଆଚରଣେ ଆମରା ଆତ୍ମପ୍ରେସେର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ।



ରାମ ଛିଲେନ ଆଦର୍ଶ ରାଜା । ତାର ରାଜ୍ୟେ କେଉ କଥନୋ କୋନଙ୍କପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନା କରେ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ତିନି ସର୍ବଦା ସଚେତ ଛିଲେନ । ତିନି ତାଁର ଶ୍ରୀ ସୀତାକେ ଭାଲୋବାସତେନ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଦେର ଯନୋରଙ୍ଗନେର ଜଳ୍ୟ ତିନି ସୀତାକେ ତ୍ୟାଗ କରାତେ ଦିଖା କରେନ ନି । ଏତେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମକ୍ଷେ ଆମରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଥାକି । ରାମେର ରାଜ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରବାଦ ଆହେ ଯେ, ରାମେର ମତୋ ରାଜ୍ୟ କଥନୋ ଛିଲ ନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେଓ ହବେ ନା । ତାଇ ଧର୍ମଚରଣେର ପାଶାପାଶି ଆମାଦେର ଧର୍ମଗ୍ରହ ରାମାୟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ ପାଠ କରା ଏବଂ ରାମାୟଣେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ ।

ପାଠ ୬ : ଧର୍ମଚରଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନୈତିକତା ଗଠନେ ମହାଭାରତେର ଶିକ୍ଷା

ମହାଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରହ । କୃଷ୍ଣବୈପାଯନ ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରେନ । ମୂଳ ମହାଭାରତ ସଂକ୍ଷିତ ଭାଷାଯ ରଚିତ । କାଶୀରାମ ଦାସ ବାଙ୍ଲାଯ ମହାଭାରତ ରଚନା କରେନ । ମହାଭାରତେର ବିଷୟବନ୍ତ କୌରବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ଯୁଦ୍ଧରେ କାହିନି । କୁରକ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହସ୍ତେଛି । ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତେଛେ 'ଯଥା-ଧର୍ମ ତଥା-ଜୟ' । କୌରବ ଓ ପାଞ୍ଚବଦେର ଯୁଦ୍ଧକେ ଉପଜୀବ୍ୟ କରେ ରଚିତ ହସ୍ତେଓ ଏ ଗ୍ରହେ ସଂଘୋଜିତ ହସ୍ତେଛେ ନାନା ଆଖ୍ୟାନ-ଉପାଖ୍ୟାନ । ଏ ସମ୍ମତ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହସ୍ତେଛେ ଧର୍ମର କଥା, ଧାର୍ମିକଗଣେର ସାମୟିକ ଦୁଃଖ-କଟେର ପର ପରିଣାମେ ତାଦେର ସାର୍ଵିକ ମଙ୍ଗଲେର କଥା । ଆର ଆହେ ଅଧର୍ମର କଥା, ଅଧାର୍ମକେର କଥା ଏବଂ ପରିଣାମେ ତାଦେର ପରାଜୟ ଓ ଧବଃ ହସ୍ତେ ଯାଓଯାର କଥା । ମହାଭାରତେ ଏ ରକମ ବହୁ କାହିନି ଉପକାହିନି ରହେଇଛେ । ଏ ସମ୍ମତ କାହିନି ଉପକାହିନି ମାନୁଷକେ ଧର୍ମର ପଥେ ପରିଚାଲିତ କରେ । ମାନୁଷକେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାଯ ପଥ୍ୟ ପରିହାର କରାତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ।

মানুষের মনে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এ জন্য সকলেরই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে- ‘যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।’ অর্থাৎ ভারতবর্ষে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বিবৃত হয়নি। মহাভারতে কুরু-পাঞ্চবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দণ্ড, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেন্তেন প্রকারে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তাঁর ন্যায়প্রাপ্তি থেকে বাধিত করা। তাই আমরা দেখি মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে, পাঞ্চবগণ তাঁদের হতরাজ্য উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এতে প্রমাণ হয়েছে যাঁরা ধার্মিক ও ন্যায়ের পথে থাকে ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন। আর যাঁরা অধর্ম ও অন্যায়ভাবে অপরের বন্ধু কেড়ে নিতে চায় ভগবান তাঁদের ক্ষমা করেন না। সাময়িকভাবে তাঁদের প্রভাব প্রতিপন্থি, ক্ষমতার দণ্ড দেখা গেলেও পরিণামে তাঁদের পতন অনিবার্য। মহাভারতে যে সমস্ত আখ্যান উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে হিংসার বিষময় ফল আর অহিংসার যে শুভ ফলপ্রাপ্তি তার প্রতিফলন ঘটেছে।

মহাভারত পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা গঠনে উদ্বৃদ্ধ হই। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে তাঁর পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মহামতি ব্যাসদেব এ মহাভারত বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নানা কাহিনি উপকাহিনি। এসকল কাহিনির দ্বারা তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ, মানবিকতা, সকলই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে- রাজার কর্তব্য, প্রজাপালন, অতিথি সেবা, ক্ষমতার চেয়ে ভক্তির উৎকর্ষতার প্রমাণ। বারবার প্রমাণ হয়েছে- ‘রাখে হরি মারে কে’, অর্থাৎ হরি যাকে রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। তাই মহাভারত পাঠে আমরা ধর্মাচরণে উদ্বৃদ্ধ হই, মানবিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি, জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পাই। সুতরাং আমাদের উচিত মহাভারত অধ্যয়ন করা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করা।

নতুন শব্দ : শ্রেয়, প্রেয়, অনুশাসন, আত্মিক, সরা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. শুক্লযজুবেদ | খ. কৃষ্ণযজুবেদ |
| গ. সামবেদ | ঘ. ঋকবেদ |

২। শ্঵েতকেতু কত বছর গুরুগৃহে ছিলেন?

- | | |
|--------|--------|
| ক. দশ | খ. বার |
| গ. চৌদ | ঘ. ষোল |

৩। রত্না শিক্ষকের উপদেশমত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। রত্নার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে –

- i. আনুগত্য
- ii. উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা
- iii. ভালো ফলের আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেয়সীর বাবা একজন শিল্পপতি। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক। তিনি সবসময় শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করেন এবং কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করেন। শ্রেয়সীও কখনও বাবার অবাধ্য হয় না। সে বাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে।

৪। শ্রেয়সীর চরিত্রে তোমার পঠিত কোন অবতারের আচরণের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. শ্রীকৃষ্ণ | খ. রামচন্দ্র |
| গ. শ্রীচৈতন্য | ঘ. বলরাম |

৫। শ্রেয়সীর আচরণে প্রকাশ পায় –

- i. ভালোবাসা
- ii. পিতৃভক্তি
- iii. অনুকম্পা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। অমিয় তার বন্ধুদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি শিশুদের একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে। আশ্রমের জন্য তাঁরা চাঁদা দেয়। কখনও বা প্রয়োজনে জোর করে চাঁদা তোলে কিংবা চুরি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করে। কারণ সে মনে করে অনাথ শিশুগুলোকে বাঁচাতে হলে সবসময় ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলবে না। কিন্তু

অমিয়র বাবা বলেন, ‘চুরি করা বা জোর করে চাঁদা আদায় উচিত নয়, সৎপথে উপার্জনের মাধ্যমেই ভালো কাজ করতে হয়’।

- ক. কোন্ গ্রস্থ পাঠ করলে ধর্মের লক্ষণগুলো সম্বন্ধে জানা যায়?
- খ. নেতৃত্বকতা গঠনে উদ্বীপকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ঝ. অমিয়র আচরণে ধর্মের যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘অমিয়র বাবার উপদেশ নেতৃত্বকতা গঠনে একান্ত সহায়ক’- তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে কথাটি মূল্যায়ন কর।

২। মিতালীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে শিক্ষক তাকে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। কিছু শিক্ষার্থী মিতালীকে সমর্থন জানালে তাদের সহযোগিতায় মিতালী যোগ্যতার সাথে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে। এতে শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীই খুশী। কিন্তু প্রিতম ও কিছু শিক্ষার্থী এটা মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে বাক-বিতঙ্গ হয়। তারা মিতালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে শিক্ষক মিতালীকে সরিয়ে প্রিতমকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে মিতালীকে দায়িত্বে ফিরিয়ে দেন এবং অভিযোগকারীদের সংশোধন হতে বলেন।

- ক. কে বাংলায় মহাভারত রচনা করেন?
- খ. মহাভারতে কুরু ও পাণবদের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন বুঝিয়ে লেখ।
- ঝ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রিতমের আচরণিক বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তুর কোন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অনুচ্ছেদের ঘটনায় বর্ণিত শিক্ষকের ভূমিকা তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তু শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মীয় উপাধ্যান ও নৈতিক শিক্ষা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ধর্মাত্মক থেকে কীভাবে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জেনেছি। বর্তমান অধ্যায়ে ধর্মাত্মক ধর্মীয় উপাধ্যান ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানব। ধর্মাত্মক বিভিন্ন ধরনের আধ্যান-উপাধ্যান ধর্মতত্ত্বের নামা বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং উপাধ্যানজগৎকে নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চসুর্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসে। সূত্রাং আমরা ধর্মীয় উপাধ্যান পাঠ করব এবং নৈতিক শিক্ষা আর্জন করব। এ অধ্যায়ে ধর্মাত্মক উপাধ্যান সন্নিবেশ করার উচ্চতা, মানবতা ও সহস্রাহস নামক দুইটি নৈতিক বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা ও তার প্রতিফলনমূলক উপাধ্যান বর্ণনা করব।

এ অধ্যায়ে শেষে আমরা—

- ধর্মাত্মক উপাধ্যান সন্নিবেশ করার উচ্চতা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার ধারণাটির ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবতার দৃষ্টান্তমূলক উপাধ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাধ্যানের শিক্ষা চিহ্নিত করতে পারব
- সহাজ ও পারিবারিক জীবনে এ শিক্ষার উচ্চতা বিশ্লেষণ করতে পারব
- নৈতিক সাহস ধারণার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৎ সাহসের দৃষ্টান্তমূলক উপাধ্যান বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণিত উপাধ্যানের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : ধর্মাত্মক উপাধ্যান সন্নিবেশ করার উচ্চতা

অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন, গীতি-গীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধি-বিধান রয়েছে ধর্মাত্মক। আমরা জানি, হিন্দুদের ধর্মাত্মক বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভাগিনী, পুরাণ, ভাস্তব, গীতা, চতী ইত্যাদি। অভিটি ধর্মাত্মক রয়েছে নামা উপাধ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, জ্ঞানের পথে চলার উপদেশ। আর এ সকল উপদেশ মানুষকে সঠিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। আমরা দেবন ধর্মকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি ধর্মাত্মকেও শ্রদ্ধা করি।



ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এতেই সমাজে হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি তিরোহিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় এবং আগ্রহভরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বা শ্রবণ করে ধন্য হয়, সুতরাং মানব জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানবের কল্যাণে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতেই ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে নানা উপাখ্যান। আমরা এসব ধর্মীয় উপাখ্যান পাঠ করে নিজেকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব। আর আমরা সবাই যদি এ নৈতিক শিক্ষায় উদ্বৃদ্ধ হই, তাহলে সমাজেও তার প্রভাব পড়বে।

একক কাজ : ধর্মগ্রন্থে কী থাকে? ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে কী হয়? এ বিষয়ে পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ ২ : মানবতার ধারণা

মনু+ষঃ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষের সহজাত কিছু প্রতিভা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যেমন- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, ইত্যাদি। এই প্রতিভাগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশু-পাখি, জীব-জন্ম, এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও এ প্রতিভাগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্ম থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। পাঠের প্রথমে যে সহজাত প্রতিভির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পশুর মধ্যেও আছে; তাই এগুলোকে পাশবিক আচরণও বলা যেতে পারে। সুতরাং শুধু পাশবিক আচরণ দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়।

একক কাজ : (ক) মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা বা সম্মান করে?
 (খ) কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংয়ম, শুন্দরুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রেণ্য (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষ সমাজবন্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কর্জে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করেছে, করেছে মহান। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের

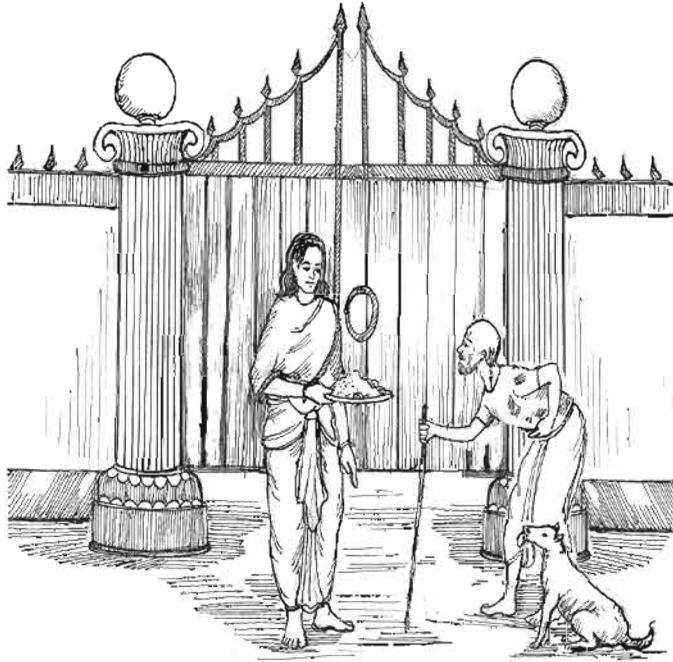
ଜୀବନେର ସର୍ବସ ଅନ୍ୟୋର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ଗେହେନ । କେବଳ ଅର୍ଥ ଦିଯେ ନୟ, ନିଜେର ଜୀବନ ଦିଯେଓ ଅନେକ ମହାନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରମ ତ୍ୟାଗେର ପରିଚୟ ଦିଇରେହେନ । ଜୀବେ ଦୟାଇ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣକର ପଥ । ନିରାଳେକେ ଅନ୍ନ, ବନ୍ଧୁହୀନେ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟାର୍ଥକେ ଜଳ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନେ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଦ୍ୟାହୀନେ ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମହୀନେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ, ବିପନ୍ନକେ ଆଶ୍ରୟ, ଭଗ୍ନାର୍ଥକେ ଅଭ୍ୟ, କୁଳକେ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଗୃହହୀନେ ଗୃହ, ଶୋକାର୍ଥକେ ସାଙ୍ଗୁନୀ ଦାନ କରା ମାନବତାରେ ଆରେକ ନାମ । ଆମରା ଆମାଦେର ଜୀବନେ ମାନବତାର ଶୂନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରବ । ଆମରା ପ୍ରକୃତ ମାନ୍ୟ ହବ ।

ଦଲୀଲ କାଜ : ମାନବିକ ଓ ପାଶ୍ଵିକ ଆଚାରମ ବା ଶୂନ୍ୟର ତୁଳନା କରେ ଛକ ତୈରି କର ।

ପାଠ ୩ : ରାତ୍ରିବର୍ମାର ମାନବତା

ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ରାତ୍ରିବର୍ମା ନାମେ ଏକ ପ୍ରଜାବଦ୍ସଳ, କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେନ । ତାର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରଜାଗପ ସୁଖେ ଶାନ୍ତିତେ ବସିବାସ କରାନେ । ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେନ ନା । ଛିଲେନ ରାଜୀର ରାଜ୍ଞୀ, ମହାରାଜୀ, ସନ୍ତ୍ରାଟ । ସନ୍ତ୍ରାଟ ହରେଓ ରାତ୍ରିବର୍ମା ପାର୍ଥିବ ବିଷସେର ପ୍ରତି ଆସନ୍ତ ନନ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଚରଣକେଇ ତିନି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ ବଲେ ଜ୍ଞାନ କରେନ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବକିଛୁ ସମର୍ପଣ କରେ ତିନି ଏକବାର ଅସାଚକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଅସାଚକ ବୃତ୍ତି ହଲୋ, କାରାନ୍ତ କାହେ କିଛୁ ଚାନ୍ଦା ଯାବେ ନା, ଲୋକେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ବା ଦୟା କରେ ଯା ଦେବେ, ତାଇ ଦିଯେଇ ଦିନ ଯାପନ କରାନେ ହବେ । ଅସାଚକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କବାର ପର ଏକେ ଏକେ ଆଟ୍ଚଟିଲ୍ଲିଶ ଦିନ କେଟେ ଗେହେ । ଏହି ଆଟ୍ଚଟିଲ୍ଲିଶ ଦିନେ କେଉଁ ତାଙ୍କେ କିଛୁଇ ଦେଯନି । ତିନିଏ ଖେତେ ଚାନନ୍ଦ, କେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କିଛୁ ଦେଯନି । ଉନପଞ୍ଚଶତମ ଦିବସେ ଏକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କେ ଏକଟି ଥାଲୀଯ କରେ କିଛୁ ଖାବାର ଦିଯେ ଗେଲେନ । ଏବାର ତାର ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ ହବେ । ହଠାତ୍ ତାର ସାମନେ ଏକଜନ ଭିକ୍ଷୁକ ଉପହିତ; ସାଥେ ଏକଟି କୁକୁର । ଉତ୍ସର୍ଗର ଶରୀର ଖୁବି କାହିଲ । ଦେଖେଇ ବୋକା ଯାଚେ, କତଦିନ କିଛୁଇ ଖାଯନି । ଭିକ୍ଷୁକ କାଂପା କାଂପା ଗଲାଯ ବଲଲ, 'କଦିନ ଧରେ କିଛୁଇ ଖେତେ ପାଇଲି, ଦୟା କରେ ଆମାକେ କିଛୁ ଖେତେ ଦିନ । ଆମାର ସାଥେ ଆମାର କୁକୁରଟିଓ ନା ଖେଯେ ଆହେ' । 'କୁର୍ଦ୍ଦାର୍ତ୍ତ' ଲୋକଟିର କର୍ମ ଅବହ୍ଳା ଦେଖେ ରାଜ୍ଞୀ ରାତ୍ରିବର୍ମାର ଚୋଥେ ଜଳ ଏଲ । କୁକୁରଟ କୁର୍ଦ୍ଦାର୍ତ୍ତ ଧୁକହେ । ରାଜ୍ଞୀ କିଛୁକ୍ଷଣ ପୂର୍ବେ ଖାବାର ଭିକ୍ଷା ପେରେହେନ, ତାର ସବଟାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଓ ତାର କୁକୁରଟିକେ ଦିଯେ ଦିଲେନ ।

'ପେଟ ଭରଲ ନା', ଭିକ୍ଷୁକ ଜାନାଲ । ରାଜ୍ଞୀ ରାତ୍ରିବର୍ମା ହାତଜୋଡ଼ କରେ ବଲଲେନ, 'ଆର ତୋ କିଛୁଇ ନେଇ, ଭାଇ' । ଏହି ନାମ ମାନବତାବୋଧ । ନିଜେ ଆଟ୍ଚଟିଲ୍ଲିଶ ଦିନ ଅନାହାରେ ଥେକେ ପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠାଗତ; ତରୁ ଅପରେର ଦୁଃଖେ ନିଜେର ଭିକ୍ଷାଲକ ଖାବାର



ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দিয়ে নিজে কষ্ট সহ্য করা, এটা যে কত বড় মানবতা, তা যে কেউ অনুধাবন করতে পারেন।

উপাখ্যানের শিক্ষা : মানবতাই ধর্ম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। আমরা মানবতা গুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে।

একক কাজ : উপাখ্যানটি পড়ে তোমরা কী শিক্ষা পেলে? এ সম্পর্কে খাতায় লেখ।

পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসাহসের ধারণা

‘সাহস’ কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। ‘সৎ’ শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তিদ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে ‘সৎ সাহস’। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। যারা ভীরু-কাপুরুষ তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের জঙ্গল স্বরূপ। আর সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহঙ্কার। তাঁরা সমাজের, দেশের বা জাতির যে কোনো বিপদে বাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ।

ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক বীরের কাহিনি আছে যাঁরা তাদের সৎসাহসের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন।

একক কাজ : সৎসাহস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

সৎসাহসী বালক তরণীসেন

ত্রেতা যুগের কথা। অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন রানি- কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। পুত্রদের মধ্যে রাম সকলের বড়। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম পিতৃসত্য পালন করতে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। তাঁর সাথে বনে যান স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণ।

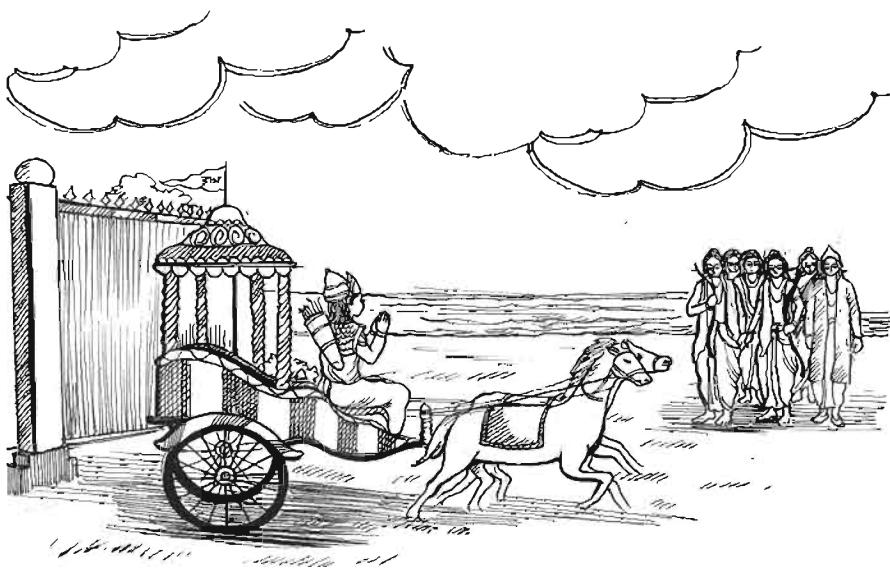
বনবাসকালে রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে একা পেয়ে হরণ করে লক্ষ্য এনে অশোক বনে বন্দি করে রাখেন। রাম সীতাকে উদ্ধার করতে সাগরে সেতু বন্ধন করে বানর বাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে লক্ষণ আক্রমণ করেন। রাবণের ভাই বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করেন রামের সাথে যুদ্ধ না করে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঞ্চি করার জন্য। কিন্তু দুষ্টমতি লক্ষণাপতি বিভীষণের কথায় কান না দিয়ে তাকে অপমান

କରେ ଲଙ୍ଘା ଥେକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦେନ । ବିଭୀଷଣ ରାମେର ଆଶ୍ରମେ ଚଲେ ଆସେନ ଏବଂ ରାମେର ପକ୍ଷେ ରାବଣେର ବିରମଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗଦାନ କରେନ ।

ରାକ୍ଷସ ବାହିନୀର ସାଥେ ରାମ-ଲଙ୍ଘଣେର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁଭ ହଲୋ । ଯୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସବାହିନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଯୋଜାରା ସବ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରଲ । ରାବଣେର ଏକଳକ୍ଷ ପୁତ୍ର ଓ ସୋଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ ନାତି ଛିଲ । ସକଳେଇ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେଛେ । ସୋନାର ଲଙ୍ଘ ପରିଷତ ହରେହେ ଶୃଙ୍ଖାନେ । ରାବଣ ବିମର୍ଶ ହେଁ ରାଜୁସଭାଯ ବସେ ପ୍ରମାଦ ଶୁଣହେନ । ଏଥିନ କୀ କରା ଯାଇ? ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରାର ଜନ୍ୟ ଏମନ କେଉ ନେଇ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଲଙ୍ଘକେ ରଙ୍ଗା କରେ ।

ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍ଘାପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରଲେଓ ତାର ତ୍ରୀ ସରମା ଓ ପୁତ୍ର ତରଣୀସେନ ଲଙ୍ଘ ପୁରୀତେଇ ଅବହାନ କରହିଲେନ । ତରଣୀସେନ ତଥନ ଧାଦଶ ବର୍ଷୀୟ ବାଲକ । ତରଣୀସେନେର କାହେ ସଂବାଦ ପେଲ ଯୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସବାହିନୀର ପରାଜୟେର କଥା, ଲଙ୍ଘର ବୀରଦେର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗେର କଥା । ସେ ତଥନ ରାବଣେର ଦରବାରେ ଉପହିଁତ ହେଁ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ । ରାବଣ ବାଲକ ତରଣୀକେ କୋଳୋମତେଇ ଏ ଶୁରୁକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରଲ । କିନ୍ତୁ ତରଣୀସେନ ରାବଣକେ ରାଜି କରିଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରଲ ।

ତରଣୀ ଛିଲ ପିତା ବିଭୀଷଣେର ମତଇ ଧାର୍ମିକ । ସେ ତାର ରଥେର ଚାଢା ରାମନାମ ଖଚିତ ପତାକାଯ ଶୋଭିତ କରଲ । ନିଜେର ସାରା ଅଜେ ରାମନାମ ଲିଖେ ନାମାବଳି ଗାଁୟେ ଦିଯେ ରଥେ ଉଠେ ବସଲ । ରଥ ଛୁଟେ ଚଲଲ ଯୁଦ୍ଧର ମୟଦାନେ । ରାମ ତାକିଯେ ଦେବେନ ରାମନାମ ଖଚିତ ଧବଜାଧାରୀ ରଥେର ଉପର ଧାଦଶ ବର୍ଷୀୟ ବାଲକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଉପହିଁତ । ରାବଣେର ଏହେ ବିବେଚନା ଦେଖେ ରାମ ବିଶ୍ଵିତ ହଲେନ । ତାର ଗାଁୟେ ରାମ ନାମେର ନାମାବଳି ଜ୍ଞାନାନୋ ।



ତରଣୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଏମେ ଧନୁର୍ବାଣ ହାତେ ନିଯେ ଜମରାମ ବଲେ ଧବନି କରେ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରତେ ଶୁରୁ କରଲ । ଅନେକ ବାନର ସୈନ୍ୟ ହତାହତ ହଲୋ । ରାମ ବାଲକ ବିବେଚନାୟ ଏବଂ ତାର ମୁଖେ ରାମ ନାମେର ଧବନି ଧବନ କରେ ତାର ପ୍ରତି ବାଣ ନିକ୍ଷେପ ନା କରେ ବିଭୀଷଣକେ ବଲଲେନ, ‘ଓହେ ମିତ୍ର ବିଭୀଷଣ! କେ ଏହି ବାଲକ? ସର୍ବଦା ମୁଖେ ରାମ ନାମ ଜ୍ଞାପ କରାଇ । ଆମି କି କରେ ଏହି ପ୍ରତି ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରି?’

তখন বিভীষণ তরণীর আসল পরিচয় রামকে বললেন না। বিভীষণ বললেন, ‘এ দুরস্ত রাক্ষস। হে প্রভু রাম, এ রাক্ষসের প্রতি তুমি বৈষ্ণব অন্ত নিষ্কেপ কর। তাহলেই এ রাক্ষসের মৃত্যু হবে।’

রাম ধনুতে বৈষ্ণব অন্ত যোজনা করলেন। তরণীসেনকে লক্ষ্য করে বাণ নিষ্কেপ করলেন রামচন্দ্র। বাণ তরণীর বক্ষে বিন্দু হলো। তরণী ‘জয়রাম, জয়রাম’ বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিভীষণ তরণীর প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে ‘হা পুত্র তরণীসেন’, বলে কেঁদে উঠলেন। এতক্ষণে রাম বুবতে পারলেন এ বীর বালক আর কেউ নয়, মিত্র বিভীষণের পুত্র তরণীসেন। রাম মিত্র বিভীষণকে ভর্ত্সনা করলেন। শেষে তরণীর মস্তকে হস্ত রেখে রাম তাকে আশীর্বাদ করলেন। তরণী রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

উপাখ্যানের শিক্ষা

স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না।

দলীয় কাজ : তরণীসেনের আদর্শ সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অ্যাচক, দ্বাদশ বর্ষীয়, ধনুর্বাণ, বৈকুণ্ঠ, দিব্যদেহ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। রামায়ণে কোন যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. সত্য | খ. দ্বাপর |
| গ. ত্রেতা | ঘ. কলি |

২। তোমার পঠিত উপাখ্যানে তরণীসেনের চরিত্রে কোন শৃণ্টি প্রকাশ পেয়েছে?

- i. আজ্ঞাত্যাগ
- ii. দেশপ্রেম
- iii. নির্বুদ্ধিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii I iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রামতনু টেলিভিশনের খবরে জানতে পারেন তাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা বন্যাকবলিত। প্রবল স্রোত ও দুর্ঘাগের কারণে উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীদের উদ্ধার করা বা সাহায্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তারা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রামতনু তখনই একটি নোকা নিয়ে তাদের উদ্ধার করতে যায় এবং সাধ্যমত উদ্ধারে ব্রতী হয়।

৩। অনুচ্ছেদে রামতনুর বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করার কাজটি হলো -

- i. কর্তব্যনিষ্ঠা
- ii. জীবসেবা
- iii. সৎসাহস

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। কোন মূল্যবোধটি রামতনুকে বন্যার্তদের উদ্ধার করার কাজটি করতে উদ্বৃদ্ধ করে?

- | | |
|--------------|----------|
| ক. মানবতাবোধ | খ. দয়া |
| গ. সহিষ্ণুতা | ঘ. ক্ষমা |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পৃথাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। একদিন পৃথা মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে বলে বের হয়ে পথের ধারে রিক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। পৃথার মা তাকে ভিক্ষা দিলেন। তা দেখে আরো কয়েকজন ভিক্ষুক এগিয়ে এল। সবাইকে ভিক্ষা দেওয়ার পর মা দেখলেন তাদের কাছে রিক্ষা ভাড়ার আর কোনো টাকা নেই। তখন তারা পায়ে হেঁটেই আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছালেন। এতে একটু কষ্ট হলেও এবং সময় বেশি লাগলেও তাদের মন মানুষের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে ভরে গেল।

- ক. রাজা রাষ্ট্রবর্মা কোন্ দেবতার ভক্ত ছিলেন?
- খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন বুঝিয়ে লেখ।
- গ. রাষ্ট্রবর্মার আচরণের যে দিকটি পৃথার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পৃথা ও তার মায়ের অনুভূতি যেন রাষ্ট্রবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন- বিশ্লেষণ কর।

ନବୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଧର୍ମପଥ ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ

ଧର୍ମପଥ ହଜେ ନ୍ୟାୟେର ପଥ, ସତ୍ୟେର ପଥ, ଅହିସା ଏବଂ କଳ୍ୟାଣେର ପଥ । ଆମରା କେବେ ଧର୍ମ ପାଲନ କରି, ମେ ସମ୍ପର୍କେ ବଳା ହୁୟେଛେ: ‘ଆଜ୍ଞାମୋକ୍ଷାୟ ଜଗଜ୍ଞିତାୟ ଚ ।’ ନିଜେର ଚିରମୁକ୍ତି, ଆର ଜଗତେର ହିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ୟାଣସାଧନେର ଜନ୍ୟ । ଜୀବନେର ସେ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଲେ ନିଜେର ମୋକ୍ଷ ବା ଚିରମୁକ୍ତି ଘଟେ ଏବଂ ସକଳେର କଳ୍ୟାଣ ହୁଯ, ମେ ପଥଟି ଧର୍ମପଥ ।

ଧର୍ମପଥେର ସଙ୍ଗେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ସମ୍ପର୍କ ରାଖେଛେ । ସା ନୈତିକ ତା ଧର୍ମ, ସା ଅନୈତିକ ତା ଅଧର୍ମ । ସିନି ଧର୍ମପଥେ ଚଲେନ, ତିନିଇ ଧାର୍ମିକ । ଧାର୍ମିକ ପାନ ବର୍ଗ ଓ ମୋକ୍ଷ । ଅଧାର୍ମିକ ପାନ ନରକ ସଙ୍କଳଣ । ବାରବାର ଜାନ୍ମ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁର କଟ । ଧର୍ମଟି ଧାର୍ମିକଙ୍କ ରଙ୍ଗକ କରେ ଏବଂ ଧର୍ମରହି ଜୟ ହୁଯ । ଧର୍ମହର୍ଷେ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟ ଦିମ୍ବେଓ ଏକଥା ବଳା ହୁୟେଛେ ।



ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ବଲିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରାଖେଛେ । ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ସତତା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁଶୀଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅପରିସୀମ । ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଶ୍ରୀକୃତ ପ୍ରକାଶେର ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ ହଜେ ପ୍ରଣାମ ଓ ନମକାର । ଆମରା ଜାନି ମାଦକାସଙ୍କି ବା ମାଦକ ଏହଳ ସୁହୁ ଜୀବନେର ପରିପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏ ପଥ ଅଧର୍ମେର ପଥ । ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକପାଦିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜେର କ୍ଷତି ହୁଯ । ଧର୍ମପଥେ ଚଲିଲେ ମାଦକାସଙ୍କିକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ସମ୍ଭବ । ଆମରା ଧର୍ମପଥେ ଚଲିବ ଏବଂ ଅଧର୍ମେର ପଥ ପରିହାର କରିବ । ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମେ ଉତ୍ସାହିତ ବିଷୟମୟୁହ ସଂକ୍ଷେପେ ଆଲୋଚନା କରିବ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶେଷେ ଆମରା-

- ଧର୍ମପଥେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ସାଥେ ଧର୍ମପଥେର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ଧାର୍ମିକଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ
- ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକଙ୍କ ପରିପଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ରଙ୍ଗକ କରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ଜୟ ହୁଯ- ଏକଥାର ଭିନ୍ନିତେ ଏକଟି ଧର୍ମୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ
- ଧର୍ମପଥ ଅନୁଶୀଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ
- ଜୀବନାଚରଣେ ‘ସତତାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପହା’- ଏକଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଏକଟି ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ପାଇବ

- ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଶିଷ୍ଟାଚାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସେବେ ପ୍ରଗାମ ଓ ନମକ୍ଷାରେର ଧାରଣା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ଅଥର୍ମେର ପଥ- ଏ ଧାରଣାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକେର କୁଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ମାଦକାସଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧେ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମୀୟ ସଂକ୍ଷତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ
- ଧର୍ମପଥେ ଚଲତେ ଉଦ୍ବ୍ଲଙ୍ଘ ହବେ, ଜୀବନାଚରଣେ ସତତ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ମାଦକ ପ୍ରତିରୋଧେ ସଚେତନ ହବେ ।

ପାଠ ୧ : ଧର୍ମପଥେର ଧାରଣା

ଧର୍ମପଥ ହଚ୍ଛେ ନ୍ୟାୟେର ପଥ । ସତ୍ୟେର ପଥ, ଅହିଂସା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣେର ପଥ । ଆମରା କେନ ଧର୍ମ ପାଲନ କରି, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ବଲା ହେଯେଛେ : ‘ଆତ୍ମମୋକ୍ଷାୟ ଜଗନ୍ନିତାୟ ଚ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମରା ଧର୍ମ ପାଲନ କରି ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ଏବଂ ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ । ଆମରା ଜାନି, ମୋକ୍ଷଲାଭେର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର ଜନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ ଆସତେ ହବେ । ଭୋଗ କରତେ ହବେ ଜନ୍ୟ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ତ୍ରଣା । ଆର ମୋକ୍ଷଲାଭ କରଲେ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ପରମାତ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଜୀବାତ୍ମା ମିଶେ ଯାବେ । ଏକେଇ ବଲେ ବ୍ରକ୍ଷଲଞ୍ଛ ହେଯା । ଏଇ ଅପର ନାମ ମୋକ୍ଷଲାଭ ।

ଏ ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଜନ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ସାଧନା କରଲେଇ ଚଲବେ ନା । ତାତେ ମୋକ୍ଷଲାଭ ହବେ ନା । ପାଶାପାଶି ଜୀବନେର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରତେ ହବେ । କାରଣ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାରାପେ ଈଶ୍ଵର ବା ପରମାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ତାଇ ଜୀବ-ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣସାଧନଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାଦର୍ଶେର ଏକଟି ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ।

ସହଜ କଥାଯ, ଯେ ପଥେ ଚଲଲେ ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ଏବଂ ଜୀବ ଓ ଜଗତେର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୟ, ସେଇ ପଥଟି ଧର୍ମପଥ ।

ଧର୍ମେର ଦଶଟି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ଣଗୁଲୋ ଅନୁସରଣ କରେ ଜୀବନ୍ୟାପନେର ଯେ ପଥ ତାକେଇ ବଲେ ଧର୍ମପଥ ।

ବେଦ

କୋଣଟା ଧର୍ମ ଆର କୋଣଟା ଅଧର୍ମ ତା ନିର୍ଣ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକୃଟ ପ୍ରମାଣ ହଚ୍ଛେ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅର୍ଥବ୍ରିଦ୍ଧି ।

ସ୍ମୃତି

ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟ ବେଦେର ପରେଇ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରେର ସ୍ଥାନ । ବେଦେର ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଅଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ରଚିତ ଗ୍ରହ୍ୟାବଳିକେ ବଲା ହୟ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର । ମନୁସଂହିତା, ପରାଶର ସଂହିତା, ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ୍ୟ ସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରେର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହ୍ୟ । ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରଗୁଲୋ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ।

ସଦାଚାର

କୋଣ ବିଷୟେ ବେଦ ଓ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବାନ୍ଧବସମ୍ମତ ଉପଦେଶ ନା ପାଓଯା ଗେଲେ ମହାପୁରୁଷଦେର ଆଚରଣକେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ହବେ ଏବଂ ସେ ପଥେଇ ଚଲତେ ହବେ । ଆବହମାନ କାଳ ଧରେ ଅନୁସ୍ତ ଓ ମହାପୁରୁଷଦେର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶୀଳିତ ଆଚରଣଟି ସଦାଚାର । ଧର୍ମାଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ୟେ ସଦାଚାର ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ।

বিবেক

অনেক সময় ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না এবং অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তখন বিবেকের বাণী গ্রহণ করতে হয়। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের বিবেককেও প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। বিবেক কী বলে? যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অঙ্গেল ডেকে আনে, বিবেক সে-কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। কাজেই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে নির্ণয় করতে হবে: কাজটি করলে ধর্ম হবে, না অধর্ম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক সেখানে বাধা দেবেই।

সুতরাং ধর্মপথ বলতে বোঝায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বিচারে ন্যায় ও সত্যের পথ এবং ধৃতি, ক্ষমা, আত্মসংঘর্ষ, অক্রোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলির প্রতিফলনমূলক পথ।

একক কাজ : ধর্মপথ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : আত্মমোক্ষায়, জগন্নিতায়, ব্রহ্মলগ্ন, স্মৃতিশাস্ত্র

পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের সম্পর্ক

আমরা জানি, কোনটা ভালো কাজ বা কল্যাণকর কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ, অকল্যাণকর কাজ, তা বিচার করার যে বোধ বা বিবেচনা শক্তি, তাকেই বলে নৈতিক মূল্যবোধ। আবার ভালো কাজ করা ধর্ম এবং মন্দ কাজ করা অধর্ম। অন্য কথায়, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। তাহলে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। আর ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ :

পরের দ্রব্য অপহরণ করা বা আত্মসাং করা নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অন্যায় এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে পরের দ্রব্য অপহরণ করা অধর্ম। অধর্ম করলে পাপ হয়। পাপ করলে ইহলোকে শাস্তি ভোগ করতে হয় এবং পরলোকে নরক যত্নগ্রামে ভোগ করতে হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ আর ধর্মানুমোদিত আচরণ করার অনুশাসনের উদ্দেশ্য একই।

নৈতিক মূল্যবোধ বলে : রাগ করবে না।

ধর্মীয় অনুশাসনও বলে : রাগ করবে না।

নৈতিকতা ধার্মিকের গুণ। যাঁর নৈতিকতা নেই তিনি অধার্মিক।

ସୁତରାଂ ଦେଖା ଯାଚେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧର୍ମପଥେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ । ଯିନି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମେନେ ଧର୍ମପଥେ ଚଲେନ, ତିନି ଧାର୍ମିକ ବଲେ ବିବେଚିତ ହନ । ଯିନି ତା କରେନ ନା, ତିନି ଅଧାର୍ମିକ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହନ ।

ଦଳୀଯ କାଜ : ଦଲେ ଆଲୋଚନା କରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସାଥେ ଧର୍ମପଥେର ସମ୍ପର୍କେର ବିଷୟେ ଦଶଟି ବାକ୍ୟ ରଚନା କର ।

ପାଠ ୩ : ଧାର୍ମିକେର ସ୍ଵରୂପ

ଧର୍ମେର ଦଶଟି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ (ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦମ, ଧୀ, ବିଦ୍ୟା, ଅକ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୃତି) ଯାଁର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବା ଯିନି ଧର୍ମେର ଏଇ ଦଶଟି ଲକ୍ଷଣ ନିଜେର ଜୀବନେ ଚଲାର ପଥେ ଅନୁସରଣ କରେନ, ତିନିଇ ଧାର୍ମିକ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ, ସ୍ମୃତି, ସଦାଚାର ଓ ବିବେକେର ଆହ୍ଵାନକେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବଲେ ମନେ କରେନ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଥନୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରାନ ନା । ତିନି କ୍ଷମତା ଥାକୁଲେଓ କ୍ଷମା କରେନ । କ୍ଷମତାର ଦସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତିନି ପରିଚାଳିତ ହନ ନା । ତିନି ସର୍ବାବସ୍ଥାଯ ନିଜେକେ ସଂଯତ କରତେ ପାରେନ ।

ଆମାଦେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋ କେବଳଇ ପରିତ୍ତ ହତେ ଚାଯ । କାମ, କ୍ରୋଧ ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସ୍ୟ ଯଥିନ ଆମାଦେର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲୋକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆମରା ତଥନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଓପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାରିଯେ ବିପଥଗାୟୀ ହଇ । କିନ୍ତୁ ଯିନି ଧାର୍ମିକ, ତିନି କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତରିକେ ଦମନ କରତେ ପାରେନ । ତିନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଇଚ୍ଛାର ଚଲେନ ନା । ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକେଇ ସଂଯତ କରେ ନିଜେର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲାତେ ପାରେନ ।

ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀଶ୍ଵର ସମ୍ପନ୍ନ । ତାର ପ୍ରଜା ତାକେ ମହାନ କରେ ତୋଳେ । ସକଳ କିଛି ବିଚାର କରାର ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦାନ କରେ । ତିନି ନାନା ବିଦ୍ୟାଯ ପାରଦର୍ଶୀ । ଧୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ତାକେ ଚରିତ୍ରେ ଉତ୍ସତତର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ନିୟେ ଯାଓଯାର କ୍ଷେତ୍ରେ ସହାୟତା କରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ । ତିନି କଥନେ ସତ୍ୟ ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ଯାନ ନା । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ ନିରାଦେଶ ଥାକେନ । ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଉତ୍ସେଲ ହନ ନା, ଦୁଃଖେ ଭେଜେ ପଡ଼େନ ନା । ଦାନ ଓ ଦୟା ଧାର୍ମିକେର ଦୂଟି ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ ଗୁଣ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଏକଟି ଦାଶନିକ ପ୍ରତ୍ୟାୟ ହଚେ : ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାଜୀପେ ଟେଶର ବାସ କରେନ । ‘ଜୀବଃ ବ୍ରକ୍ଷେବ ନାପରଃ’— ଜୀବ ବ୍ରକ୍ଷ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ ନାହିଁ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତରାଚାର୍ମେର ଏ ବାଣୀ ଦୃଢ଼ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ । ତିନି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ନିଷାମ କର୍ମ ଏବଂ ଅକୁଞ୍ଚ ତଗବଦ୍ଭକ୍ତିକେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧେ ପରିଗତ କରେଛେ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୟୀ । ତିନି ନିଜେକେ ତୃଗେର ଚୟେଓ ନୀତ୍ୟ ମନେ କରେନ । ତିନି ବୃକ୍ଷେର ଚୟେଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହନ । ତିନି ସମଦର୍ଶୀ । ତାର କାହେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ନେଇ । ଜାତିଭେଦ ନେଇ । ଧର୍ମ-ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷେ ସକଳକେ ତିନି ସମାନ ବିବେଚନା କରେନ ।

ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗେର ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରେନ । ତିନି ଯୋଗ୍ୟକୁ ହୁଏ ଜଗତେର ହିତସାଧନେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରେନ । ଜୀବପ୍ରେମ ବା ଜୀବସେବାକେ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲେ ବିବେଚନା କରେନ । ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ-ୟାପନ କରେନ । ଧାର୍ମିକେର ଏ ଜୀବନବୋଧ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାଁର ନେଇ, ତିନି ଅଧାର୍ମିକ ।

ଏକକ କାଜ : ଧାର୍ମିକେର ପ୍ରାଚିଟି ଗୁଣ ଚିହ୍ନିତ କର ।

পাঠ ৪ : ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণতি

ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময়, সদা প্রফুল্ল। প্রাণি তাঁকে অহংকারী করে না, অপ্রাণি তাঁকে বিষণ্ণ করে না। তিনি তাঁর কর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বলে বিবেচনা করেন এবং সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সম্পর্গ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগ করে আনন্দ পান। সেবা করে তৃষ্ণ হন। তাঁর কর্ম জ্ঞান দ্বারা পরিসুত এবং ভক্তি দ্বারা বিশোধিত।

ধর্মগ্রন্থে আছে, ধার্মিক ইহলোকে শান্তি পান এবং পরলোকে তাঁর স্বর্গ লাভ হয়। ধার্মিক ধর্মকর্মের মাধ্যমে চরম অবস্থায় ব্রক্ষ লাভ করেন, তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং ধার্মিক মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করেন।

অন্যদিকে অধার্মিক সবসময় অত্যন্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ণ থাকেন। কাম তাঁকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাঁকে উত্তেজিত করে, লোভ তাঁকে আকর্ষণ করে তাঁর অধঃপতন ঘটায়।

ইহলোকে তিনি কু-কর্মে লিঙ্গ থাকেন। কখনও কখনও কৃত কু-কর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কু-কর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাঁকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণিকে জন্মাদ্ধারণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।

তবে অধর্মের পথ পরিহার করে ধর্মপথে চললে পাপীও পরিশুন্দ হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। লাভ করতে পারে পরম করুণাময় ভগবানের করুণা।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্মের জয় হয়। অধর্মের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান। ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মের জয় সম্পর্কে আমরা একটি উপাখ্যান জানব।

দলীয় কাজ : আলোচনা করে ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণতি সম্পর্কে দর্শন বাক্য রচনা কর।

ପାଠ ୫ : ଉପାଧ୍ୟାନ

ଧର୍ମର ଜୟ

ଅନେକ ଅନେକକାଳ ଆଗେର କଥା । ତଥନ ହିଲ ସତ୍ୟଯୁଗ ।

ଦୈତ୍ୟଦେର ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ।

ଦୈତ୍ୟ ଆର ଦେବଭାଦେର ମଧ୍ୟେ ଚିରକାଳେର ଝାଗଡ଼ା । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଓ ତାର ସ୍ଵତିତ୍ରମ ହବେନ କେନ ?

ତିନିଓ ଛିଲେନ ହରିବିଦେବୀ । କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟକୁଳେ ଜନ୍ମ ନିରୋଛିଲେନ ଏକ ହରିଭକ୍ତ । ତିନି ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର । ନାମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ।

ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ଶୁରୁର କାହେ ଅନ୍ୟ ବାଲକଦେର ସାଥେ ପାଠ ପ୍ରହଳାଦକେ ପାଠାନ୍ତିର ପାଠାନ୍ତିର ହଲୋ । କିନ୍ତୁ ପାଠେ ଯନ ନେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦର । ସେଥାନେ ତାଁର ହରିଭକ୍ତ ହଦୟ ତୃଣି ପାଞ୍ଚେ ନା ।

ଏକଦିନ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ କୋଳେ ବସିଯେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେନ-

- ବରସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କୋନ ବଞ୍ଚି ତୋମାର ସବଚେଯେ ପ୍ରିୟ ବଲ ତୋ ?

- ପାର୍ଥିବ କୋନେ ଜିନିସଇ ଆମାର ପ୍ରିୟ ନାୟ, ବାବା । ନିବିଡ଼ ବନେ ପିରେ ଶାନ୍ତ ହଦୟେ ଶ୍ରୀହରିର ଆଶ୍ରଯ ନେଇଥାଏଇ ଆମାର ଆନନ୍ଦ ।

ଆବାକ ହସେ ଗେଲେନ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ । କେ ତାର ଛେଲେର କାନେ ଏହି ହରିନାମ ଦିଯେଛେ ? ଶିଖଦେର ବୁଦ୍ଧି ଏଭାବେଇ ପରେର ବୁଦ୍ଧିତେ ନଷ୍ଟ ହସ ।

- ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ଆବାର ଶୁରୁଗୁହେ ପାଠାଓ, ତାର ସୁଶିକ୍ଷାର ଜଳ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ନାଓ— ବଲାଲେନ ରାଜା ।

କିନ୍ତୁ ଶତ ଚଢାତେଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୋଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଲୋ ନା । ତଥନ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ପୃଥିବୀ ଥେକେ ସରିଯେ ଦେଯାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ । ରାଜାର ଆଦେଶ ପେଯେ ହଙ୍କାର ଦିଲେ ଏଗିଲେ ଏଳ ଦୈତ୍ୟେରା । ଡର୍ବଂକର ତାଦେର ଚେହାରା । ହାତେ ତୌଳ୍ମିକ ଶୂଲ । ଯାର ଅଗ୍ରଭାଗେ ମୃତ୍ୟୁର ଆମଦନ୍ତଣ । ବଲଶାଳୀ ଅସୁରେରା ବାଲକ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୁସୁମକୋମଳ ବକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲ ଶୂଲ । କିନ୍ତୁ ହରିନାମେ ପବିତ୍ର ବକ୍ଷେ ମେହି ଶୂଲ ବିଜ୍ଞ ହଲୋ ନା ।



ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ଦେଯା ହଲୋ ବିଷମିତ୍ରିତ ଅନ୍ନ । ଦେଯା ହଲୋ ହତିର ପାଯେର ନିଚେ । ତାଁକେ ନିକ୍ଷେପ କରା ହଲୋ ବିଷଧର ସର୍ପର ପ୍ରକୋଷ୍ଠି । ସୁଉଚ୍ଛ ପର୍ବତ ଥେକେ ତାଁକେ ଛୁଟେ ଫେଲା ହଲୋ କଲୋଲିତ ମହାସମୁଦ୍ରେ ।

- କି ହଲୋ ?- ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେନ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ।

- ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ କୋନୋଭାବେଇ ହତ୍ୟା କରା ଯାଚେ ନା, ମହାରାଜ । - ବଲଲ ଶାତକେରା ।

ମହାକୋଣ୍ଡେ ଆରଙ୍ଗଚକ୍ର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ବଧ କରାର ଜନ୍ୟ ଛୁଟେ ଗେଲେନ ।

ଏକକ କାହିଁ : ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ତାଁର ପିତା ଶାନ୍ତି ଦେଉୟାର ଜନ୍ୟ ଯେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେନ, ତାର ଏକଟା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

- রে দুর্বিনীত, তুই কার বলে আমার শক্তির পূজা করছিস? উপেক্ষা করছিস আমার আদেশ?
- ধর্মের বলে, বাবা। যাকে তুমি শক্তি বলছ তিনি শক্তি নন, বাবা। তিনি সকলের বন্ধু, সকলের প্রাণ, সকলের আণকারী প্রভু। তিনি সর্বত্র আছেন। সর্বত্র থাকেন। সর্বত্র থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেন।
- সর্বত্র থাকেন? - ক্রোধে জুলে উঠলেন হিরণ্যকশিপু।
- আছে? এই স্ফটিক স্তম্ভে তোর হরি আছে?
- আছেন, বাবা। - প্রহ্লাদের বিনীত উত্তর।
- তাই নাকি। - সিংহাসন থেকে উঠে দ্রুতবেগে স্তম্ভের দিকে ধেয়ে গেলেন হিরণ্যকশিপু। মুষ্টির আঘাত করলেন স্তম্ভের উপরে।

তীর্ণণ শব্দ হলো সেই স্তম্ভে।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকল্পিত হলো সেই মহাশব্দে। দেবগণ পর্যন্ত ভীত হলেন সেই শব্দ শুনে।

হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন, কোনো দেব, নর, যক্ষ, প্রভৃতি কেউ কোনো অস্ত্র দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতালে কোনো স্থানে, দিনে বা রাতে তাঁকে হত্যা করতে পারবে না।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ভগবান শ্রীহরি বেরিয়ে এলেন নৃসিংহ মূর্তিতে। বসে আছেন তিনি ভাঙা স্তম্ভকেই আসন বানিয়ে। হিরণ্যকশিপু তাঁকে খড়গ দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। তখন নৃসিংহ অবতাররূপী শ্রীহরি হংকার ছেড়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে কোলের উপর ফেলে নখ দিয়ে হত্যা করলেন।

শ্রীহরি প্রহ্লাদকে দেখা দিলেন। প্রহ্লাদ তাঁর কাছে থেকে চেয়ে নিল শ্রীহরির প্রতি অবিচল ভক্তি। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মই প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিল। ধর্মের জয় অবশ্যস্তাবী।

একক কাজ : ধর্মের জয় উপাখ্যান থেকে কী শিক্ষা পেলে? লেখ।

নতুন শব্দ : সত্যমুগ, হিরণ্যকশিপু, দৈত্যকুল, পার্থিব, শূল, প্রকোষ্ঠ, আরঞ্জচক্ষু, দুর্বিনীত, অবশ্যস্তাবী।

পাঠ ৬ : ধর্মপথ ও পারিবারিক জীবন

মানুষ পরিবারবন্ধ হয়ে বাস করে। আর আমরা তো জানি পরিবারের সকল সদস্যের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা থাকে। তাই ধর্মপথ অনুসরণ তথা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারে বড়দের কাছ থেকে ছোটরা আচার-আচরণ শেখে। পরিবারের ছোটরা বড়দের অনুসরণ ও অনুকরণ করে। তাই পরিবারে ধর্মপথ অনুশীলন-অনুসরণের চর্চা থাকা চাই। পরিবারে যদি সর্বদা সত্য কথার চর্চা হয়, কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় না নেয়, তাহলে সে পরিবারের কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেবে না।

ପରିବାରେ ସଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଆତ୍ମସଂସ୍ଥମ ଶେଖାନୋ ହୟ, ଲୋଭକେ ଦମନ କରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାକେ, ତାହଳେ ସେ ପରିବାରେ କେଉଁ ଲୋଭୀ ହବେ ନା । ଯେ ପରିବାରେ ଧର୍ମଦର୍ଶ ‘ରେଗେ ଗେଲେନ ତୋ ହେରେ ଗେଲେନ’- ଏ ଅତ୍ରୋଧେର ଚେତନା, ସେ ପରିବାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜ କରବେଇ । ସହମର୍ମିତା ଓ ପରମତସହିଷ୍ଣୁତା ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନେର ଏକଟି ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ । ଏର ଅଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂହତି ବିନଷ୍ଟ ହୟ ।

ପରିବାରେ କେଉଁ ସଦ୍ଵିଷ୍ଟ ନିଜେର ମତ ଅନ୍ୟେ ଓପର ଚାପିଯେ ଦେଇ, ତାହଳେ ପରମତସହିଷ୍ଣୁତାର ଆଦର୍ଶ ସେ ପରିବାରେ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ଓହି ପରିବାରେ ସଦସ୍ୟରା ସମାଜେଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଦେଖାନ ନା । ଅତି ଆଦରେର ଶିଶୁ-କିଶୋର ସଦସ୍ୟରା ମା-ବାବାକେ ନିଜେର ମତ ଅନୁସାରେ କାଜ କରତେ ବାଧ୍ୟ କରେ । ସଥନ ଯା ଚାଇବେ, ତା ଦିତେ ହବେ । ଏ ମାନସିକତା ନିଯେ ସେ ସଥନ ସମାଜ-ଜୀବନେ ଆଚରଣ କରତେ ଯାଇ, ତଥନ ସେ ପରମତସହିଷ୍ଣୁତା ତୋ ଦେଖାଯଇ ନା, ବରଂ ନିଜେର ମତ ଜୋର କରେ ଅନ୍ୟେ ଉପର ଚାପିଯେ ଦେଓଯାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ପରିବାରେ ସଦସ୍ୟରା ସତତା, ସତ୍ୟପ୍ରିୟତା, ପରମତସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ମାନବତାଯ ମଞ୍ଚିତ ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ କରଲେ, ପରିବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକବେ । ଆର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ସଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଧର୍ମପଥେ ଚଲେ, ତାହଳେ ସମାଜେ ଧର୍ମପଥେ ଚଲବେ । ସୁତରାଂ ଧର୍ମପଥ ଅନୁସରଣ-ଅନୁଶୀଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପରିବାରେ ଭୂମିକା ଖୁବହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଦଲୀଯ କାଜ : ଧର୍ମପଥ ଅନୁଶୀଳନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କେ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ ଦଶଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଏବଂ ଏକଟି ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।

ପାଠ ୭ : ସତତାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଢ଼ା

ମିଥ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଲେ ତାର ଫଳ ଭାଲୋ ହୟ ନା । ତାଇ ବଲା ହୟ, ‘ସତତାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଢ଼ା’ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଉପାଖ୍ୟାନେର ବିବରଣ ଦେବ ।

ଗରିବ କାର୍ତୁରିଯାର ସତତା

ଛାଇମୁନିବିଡ଼ ଛୋଟ ଏକଟି ଗ୍ରାମ । ଗ୍ରାମେର ପାଶେ ବନ । ଆର ଗ୍ରାମେର ପାଶ ଦିଯେ ବସେ ଚଲେଛେ ଛୋଟ ଏକଟା ନଦୀ । ଏହି ଗ୍ରାମେ ବାସ କରନେନ ଏକ ଗରିବ କାର୍ତୁରିଯା । ପାଶେର ବନ ଥିଲେ କାଠ କେଟେ ବିକ୍ରି କରେ ସଂସାର ଚାଲାନେନ ତିନି ।

ଏକଦିନ ତିନି ବନେ କାଠ କାଟିଲେ ଗେହେନ । ଯେ ଗାହେର ଡାଲଟା ତିନି କୁଠାର ଦିଯେ କାଟିଛିଲେ, ସେଟା ନଦୀର ଓପର ଦିଯେ ନଦୀର ଦିକେ ଅନେକଟା ଏଗିଯେ ଗିଯେଛିଲି ।

ଗାହେର ଡାଲଟା କାଟାର ସମୟ ହଠାତ୍ ଏକ ଅସ୍ଟନ ଘଟିଲ । କାର୍ତୁରିଯାର ଅସତର୍କତାଯ ତାଙ୍କ କୁଠାରଟା ପଡ଼େ ଗେଲ ନଦୀତେ । ଘରେ ଖାବାର ନେଇ । କାଠ କେଟେ ବିକ୍ରି କରିବେନ, ତାରପର ଚାଲ-ଡାଲ ସବ କିନିବେନ, ତବେ ପରିବାରେ ସବାଇ ମିଳେ ଥାବେନ!

ଏଥନ ଯେ ସବାଇ ମିଳେ ଉପୋସ କରେ ଥାକତେ ହବେ! ମନେର ଦୁଃଖେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ ତିନି ।

କାର୍ତ୍ତରିଆର ଦୁଃଖେ ଜଳଦେବତାର ଦୟା ହଲୋ । ତିନି ନଦୀର ଭେତର ଥେବେ ଉପରେ ଉଠେ ଏଲେନ । ଶ୍ରୀରେଣ
ଅର୍ଦେକଟା ଜଳେ, ଅର୍ଦେକଟା ଜଳେର ଉପରେ ।

- ଶୋନ କାର୍ତ୍ତରିଆ ।

ଡାକ ଶୁଣେ ନଦୀର ଦିକେ ତାକାତେଇ କାର୍ତ୍ତରିଆ ଦେଖେ, ଜଳଦେବତା ତାକିଯେ ଆହେ ତା'ର ଦିକେ । ମିଟିମିଟି
ହାସହେଲ । ତା'ର ହାତେ ବ୍ରାହ୍ମେ ଏକଟି ସୋନାର କୁଠାର ।

ଜଳଦେବତା କାର୍ତ୍ତରିଆକେ ଜିଜେସ କରଲେନ,

- ଏ କୁଠାରଟାଇ ତୋ ତୋମାର, ତାଇ ନା !

କାର୍ତ୍ତରିଆ ଜଳଦେବତାର ହାତେର କୁଠାରେ ଦିକେ ତାକାଲେନ । ରୋଦେର ଆଶୋଯ ବକରକ କରହେ ସୋନାର କୁଠାର ।
ଏ କୁଠାରଟି ତା'ର ନିଜେର ବଳେ ନିଯେ ନିତେ ପାରେନ ତିନି । ତାତେ ତା'ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-ଦୁଃଖ-କଟ ଦୂର ହୟେ ଯାବେ ।
ସୋନାଳି ସୁଧେର ଆଶୋତେ ଭରେ ଉଠିବେ ତାଦେର ଜୀବନ, ତାଦେର ସଂସାର । କିଞ୍ଚି ତାତେ ଧର୍ମ ନଟ ହବେ । ଅସଂ
ହସେ ଯାବେନ ତିନି । ଏକ ମୁହଁରେ ସବଟା ଭେବେ ନିଯେ କାର୍ତ୍ତରିଆ ମାଥା ନେଡ଼େ ଜଳଦେବତାକେ ଜାନାଲେନ,

- ଓଟା ଆମାର କୁଠାର ନଯ ।

- 'ତାଇ ନାକି !'- ହେସେ ବଲଲେନ ଜଳଦେବତା ।

- ଏକଟୁ ଅପେକ୍ଷା କରୋ ଆମି ଆସଛି ।

ଜଳଦେବତା ଆବାର ଡୁବ ଦିଲେନ ନଦୀର ଜଳେ । ଜଳ ଥେବେ ଉଠେ ଏସେ ଏବାର ତିନି କାର୍ତ୍ତରିଆକେ ଏକଟା
ରୂପାର କୁଠାର ଦେଖାଲେନ । ଏବାରା କାର୍ତ୍ତରିଆ ଜାନାଲେନ, ଏ କୁଠାରଟିଓ ତା'ର ନଯ ।

ଜଳଦେବତା କାର୍ତ୍ତରିଆକେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ବଳେ ଆବାର ନଦୀର ଜଳେ ଡୁବ ଦିଲେନ । ଏବାର ତିନି ନିଯେ ଏଲେନ
କାର୍ତ୍ତରିଆର ନିଜେର ଲୋହାର କୁଠାର । କାର୍ତ୍ତରିଆ ସେହି ଲୋହାର କୁଟାରଟି ଦେଖେ ବଳେ ଉଠିଲେନ,

- ହୁଁ ହ୍ୟା, ଏହି ତୋ ଆମାର କୁଠାର ।

ଜଳଦେବତା ମୁଖ ହଲେନ ଦରିଦ୍ର କାର୍ତ୍ତରିଆର ସତତାଯ ।

ତିନି କାର୍ତ୍ତରିଆକେ ସୋନା ଓ ରୂପାର କୁଠାର ଦୂଟିଓ
ଦିଯେ ଦିଲେନ ।

କାର୍ତ୍ତରିଆର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହଲୋ । ତା'କେ ଆର ଅତୋ କଟ
କରେ କାଠ କାଟିବେ ହୟ ନା । କୁଁଡ଼େଯରେ ଜାଗଗାର
ଦାଳାନ ଉଠିଲ । ବେଶ କିଛି ଜମିଓ କିନଲେନ ତିନି ।

ତାଇ ନା ଦେଖେ ଗୌମେର ମୋଡ଼ଳ ଅବାକ ହୟେ ଗେଲେନ ।
କେମନ କରେ ଏତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦରିଦ୍ର କାର୍ତ୍ତରିଆ ଧନୀ
ହୟେ ଗେଲ ।

ମୋଡ଼ଳ ଏଲେନ କାର୍ତ୍ତରିଆର ବାଡ଼ି ।

କାର୍ତ୍ତରିଆର କାହେ ସବ ଶଲଲେନ ।



- ‘ଓ, ତାହଲେ ଏଇ କଥା! ଜଳଦେବତାର କୃପାୟ ଧନୀ! ଆଚ୍ଛା ।’- ମନେ ମନେ ବଲଲେନ ତିନି ।
ଏଥନ ସେ ସବାଇ ମିଳେ ଉପୋସ କରେ ଥାକତେ ହବେ! ମନେର ଦୁଃଖେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ ତିନି ।
ତାରପର ଇଚ୍ଛେ କରେ ହାତେର ଲୋହାର କୁଠାର ନଦୀତେ ଫେଲେ ଦିଯେ ହାଉମ୍‌ଆଟ କରେ କାନ୍ଦତେ ଲାଗଲେନ ।
ଜଳଦେବତା ଉଠେ ଏଲେନ ଏକଟି ସୋନାର କୁଠାର ନିଯେ ।

- ଏଇ କୁଠାର କି ତୋମାର?

ଲୋଭେ ଚକଚକ କରେ ଉଠିଲ ମୋଡ଼ଲେର ଚୋଥ ।

ତିନି ବ୍ୟଗ୍ରକଟେ ବଲେ ଉଠିଲେନ,

- ହଁ, ହଁ, ଏଟାଇ ଆମାର କୁଠାର ।

ଜଳଦେବତା ଖୁବ ରେଗେ ଗେଲେନ । ତିନି ସୋନାର କୁଠାର ନିଯେ ଡୁବ ଦିଲେନ ନଦୀର ଭେତରେ ।

ଅନେକକ୍ଷଣ ହୟେ ଗେଲ ।

ଜଳଦେବତା ଆର ଉଠିଲେନ ନା ।

ମୋଡ଼ଲ ବିରସ ବଦନେ, ବିଷଗ୍ନ ମନେ ଫିରେ ଗେଲେନ ତାଁର ଗାଁଯେ ।

ମିଥ୍ୟାଚାର ନୟ । ସତତାଇ ଉଂକୁଟ ପଥା । ଏ-କଥା ଆମରା ମନେ ରାଖବ ଏବଂ ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରେ ସତତାର ପରିଚୟ ଦେବ ।

ଏକକ କାଜ : କାର୍ତ୍ତୁରିଆର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହଲୋ କିଭାବେ? ବୋର୍ଡେ ଲେଖ ।

ପାଠ ୮ : ଶିଷ୍ଟାଚାର

ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଧାରଣା

ସତତାର ମତୋ ଶିଷ୍ଟାଚାରଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନେର ଅଙ୍ଗ । ଆମାଦେର ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅପରିହାର୍ୟ । ନୟ, ଭଦ୍ର ବା ଶିଷ୍ଟ ଆଚାରକେ ବଲେ ଶିଷ୍ଟାଚାର । ଶିଷ୍ଟାଚାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ । ଏ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷ ପଣ୍ଡ-ପାଥି ଥେକେ ଆଲାଦା ।

ଧର୍ମପଥେ ଚଲାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟତମ ପାଥେଯ । ପ୍ରଥମେ ପରିବାରେର କଥାଇ ଧରା ଯାକ ।

ମାତା, ପିତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁରୁଜନକେ ଆମରା ପ୍ରଣାମ ଜାନାଇ । ଏଇ ପ୍ରଣାମ ଜାନାନୋର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇ, ତାର ନାମ ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ।

ଆବାର ସମବୟସୀଦେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାନାଇ ଏବଂ ଛୋଟଦେର ସ୍ନେହ କରି । ସବାଇ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ରକମଫେର ।

ইন্দ্র আশাদের সৃষ্টি করেছেন। দেবদেবীরা আশাদের নিজ নিজ শক্তি বা কণ দিয়ে সহায়তা করেন।

তাই আমরা তাদের জ্ঞব-জ্ঞতি করি, প্রশান্নমত্ত উচ্চারণ করে তাদের প্রশংস জানাই। তাই ধর্মীচারের মধ্য দিয়েও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়। শিষ্টাচার একটি লৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মের অঙ্গ।

শিষ্টাচার বা তত্ত্ব ব্যবহারের বাবা আমরা ঘানুষের মন জয় করতে পারি। সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় কণ বা লৈতিক মূল্যবোধ।

কারণ সঙ্গে দেখা হলে আমরা অভিজ্ঞ বিনিময় করি। আমরা বড়দের অধ্যায় করি বা নমস্কার জানাই। সমবয়সীদের অভিজ্ঞ জানাই এবং ছোটদের আশীর্বাদ করি। একেরে প্রথাগত শিষ্টাচার হচ্ছে, বরদে থেকে, সে প্রশংস বা নমস্কার জানাবে। বড়রা কল্পাখ হোক, দীর্ঘজীবী হও ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করবেন। এটাই গ্রীতি।

প্রশংস বা নমস্কারের ধারণা

প্রশংস বলতে বোঝায় প্রকৃষ্টদর্শে নমন বা নমস্কার। হরিচরণ বক্ষ্যাপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় ‘শৰ্মকোব’ অব্রে উল্লেখ করেছেন, প্রশংস চার একান্ত:

১. অতিবাদন
২. পরামুক্ত প্রশংস
৩. অঠার প্রশংস
৪. নমস্কার

অতিবাদন

বাক্য দ্বারা ‘প্রশংস করি’ বলে আনন্দ হওয়াকে অতিবাদন বলা হয়। অনেক সময় বাক্য উচ্চারণ না করে কেবল আনন্দ হওয়েও অতিবাদন জানানো হয়।

পরামুক্ত প্রশংস

‘তত্ত্বসার’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-

বাহুবল, জ্ঞানুষ্ঠান, মনুক, বক্ষুল ও দর্শনেশ্বর রোগে অবলত হয়ে বে প্রশংস করা হয় তাকে পরামুক্ত প্রশংস বলে।



অঠার প্রশংস

জ্ঞান, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুক্ষি, শির, বাক্য ও মৃতি- প্রশংসের এ আটটি অঙ্গ। এ আটটি অঙ্গ ব্যবহার করে প্রশংস করলে তাকে অঠার বা সাঁজাহ প্রশংস বলে।

ନମକ୍ଷାର

ନମକ୍ଷାର ପ୍ରଗାମେର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ । ତବେ ଏଥାମେ ନମକ୍ଷାର ହଚ୍ଛେ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ମାଥାଯ ଠେକାନୋ । ନମକ୍ଷାର ତିନି ପ୍ରକାର । ସଥା- କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ।

ନମକ୍ଷାରେର ମାହାତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣେ ବଲା ହେଯେଛେ-

‘ନମକ୍ଷାରଃ ସ୍ମୃତୋ ଯଜ୍ଞଃ ସର୍ବୟଜ୍ଞେସୁ ଚୋତ୍ତମଃ ।

ନମକ୍ଷାରେଣ ଚୈକେନ ନରଃ ପୁତୋ ହରିଂ ବ୍ରଜେ ॥’

ଅର୍ଥାତ୍ ନମକ୍ଷାର ସକଳ ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥାନ । ଏକମାତ୍ର ନମକ୍ଷାର ଦ୍ୱାରା ମାନବ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଁ ହରିକେ ଲାଭ କରେ ।

ଏକକ କାଜ : ପ୍ରଗାମ କତ ପ୍ରକାର ଓ କୀ କୀ ? ଲେଖ

ଆମରା ପୂଜା କରାର ସମୟ ମିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମମଣ୍ଡଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବ-ଦେଵୀଦେର ପ୍ରଗାମ ଜାନାଇ । ଶୁରୁଜନଦେର ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ନମକ୍ଷାର ଜାନାଇ ।

ସାଧୁ-ସଜ୍ଜନ-ବୈଷ୍ଣବ-ଭକ୍ତରୋ ସବାଇକେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକ୍ଷାର କରେନ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଧର୍ମଦର୍ଶନ ରଯେଛେ । ଆସଲେ ଆମରା ପ୍ରଗାମ ବା ନମକ୍ଷାର କରାହି କାକେ ?

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଚ୍ଛେ- ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାରୂପେ ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଶ୍ଵର ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ସେଇ ବ୍ରକ୍ଷକେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକ୍ଷାର କରାହି ।

ଏ ଧର୍ମଦର୍ଶନେର କାରଣେ ସକଳେଇ ପ୍ରଗମ୍ୟ । ସୁତରାଂ ଶିଷ୍ଟାଚାରେର ଅଙ୍ଗରୂପେ ପ୍ରଗାମ ବା ନମକ୍ଷାରେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ତାତ୍ପର୍ୟ ରଯେଛେ ।

ପାଠ ୯ : ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ଅଧର୍ମେର ପଥ

ଆମରା ଜାନି ମାଦକ ଗ୍ରହଣ ବା ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵ ଅନୈତିକ ଏବଂ ଅଧର୍ମେର ପଥ । କାରଣ ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵ ମାଦକ ଗ୍ରହଣକାରୀର ସ୍ଵାଭାବିକ ଚେତନାକେ ବିମୃଢ଼ କରେ ଦେଇ । ତିନି ଆର ପ୍ରକୃତିସ୍ତୁ ଥାକେନ ନା, ସୁନ୍ତ୍ର ଥାକେନ ନା । ଆର ଅସୁନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଓ ମନେ ତିନି ଯେ ଆଚରଣ କରେନ, ତାତେ ଅନୈତିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

ଧୂମପାନ, ମଦ, ଗୌଜା, ଆଫିମ, ହେରୋଇନ, କୋଡ଼ିନ (ଫେନ୍‌ସିଡ଼ିଲ) ଇତ୍ୟାଦି ମାଦକ । ଏଗୁଲୋ ଗ୍ରହଣ କରା ଏକବାର ଶୁରୁ ହୁଲେ ତା ନେଶାୟ ପରିଣତ ହୁଏ ଆର ସହଜେ ଛାଡ଼ା ଯାଇ ନା । ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ନା ପେଲେ ଅଷ୍ଟିର ହେଁ ଓଠେନ । ତାର ଆଚରଣ କଖନେ କଖନେ ହେଁ ଓଠେ ଧବଂସାତ୍ମକ ।

ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵର କୁକ୍ଳ

ଧୂମପାନ ଓ ମାଦକାସତ୍ତ୍ଵ ଦୈତିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ । ଧୂମପାନେର ଫଳେ ନାନାବିଧ ରୋଗ ହୁଏ । ସେମନ- ନିଉମୋନିଆ, ବ୍ରଙ୍କାଇଟିସ, ସଙ୍କ୍ଷା, ଫୁସଫୁସେର କ୍ୟାଙ୍ଗାର, ଗ୍ୟାସିଟିକ ଆଲସାର, କ୍ରୁଧାମାନ୍ୟ, ହୁଦରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି । ତା ଛାଡ଼ା ଧୂମପାନ ଶୁଦ୍ଧ ଧୂମପାନୀରଇ କ୍ଷତି କରେ ନା, ଅନ୍ୟଦେରଓ କ୍ଷତିର
୧୦ କାରଣ ହୁଏ ।

মাদকগ্রহণেও নানা প্রকার অসুব্ধ হয় এবং মাদকাসঙ্গ ব্যাজাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যান। মাদকগ্রহণে মানসিক ক্ষতি হয়। মাদকাসঙ্গ অবস্থায় বিবেকবৃদ্ধি লোপ পায়। মাদকাসঙ্গের চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেতে পারে। মাদকাসঙ্গ ব্যক্তির মন্তিকবিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে। যাদকদ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ যোগাড় করতে গিয়ে মাদকাসঙ্গ অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও দিখা করে না। মাদকাসঙ্গের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হয়ে যায়।



মাদকাসঙ্গ প্রতিরোধে পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতির ভূমতু

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উত্তুক করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মার পেশ ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। হিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসঙ্গ ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসঙ্গই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসঙ্গের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসঙ্গকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দাস্তিত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে।

সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উত্তুক করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উত্তুক হয়ে মহত্তর সাধনায় লিঙ্গ থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উত্তোলিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে- ‘আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়’।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে আমরা এমন শিক্ষা পেতে চাই, যা পরিবারের সকল সদস্যকে ধূমপান ও মাদকগ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখে। পরিবারের সবাই যেন অঙ্গীকার করে-

‘ধূমপান মাদকগ্রহণ অধর্মের পথ।

চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।’

ବାଡ଼ିର କାଜ :

১. নিজের জীবন থেকে শিষ্টাচার প্রদর্শনের ঘটনা লিখে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।
 ২. ‘ধূমপান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা’- শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ :

୧ । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରାଜା ଛିଲେନ-

- ক. দৈত্যদের খ. দেবতাদের
গ. পশুদের ঘ. মানবকলের

২। মানবকে কেন নরক যত্নণা ভোগের পর মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়?

- ক. পাপ ক্ষয় হয় বলে
 - খ. পাপ নিঃশেষ হয় না বলে
 - গ. পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য
 - ঘ. পুরুষীকে ভালোবাসার কারণে

উদ্বীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ରୋଡେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ବିଜ୍ଞାନେ ଛବି ଏକେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦେଖାବେ ବଲେ ବେଳେର ଉପର ରାଖିଲା । ଶିଥା ହାତେର ଧାକ୍କାଯା ‘ଓୟାଟାର ପଟ’ ଉଲ୍ଟେ ଦିଲେ ସେଟ୍‌ଟା ନଷ୍ଟ ହୁୟେ ଯାଇ । ପରେର ଦିନ ମେ ଆବାର ଏକେ ଆନଳେ ଶିଥା ଏବାରଓ ତା ନଷ୍ଟ କରାର ଚଢ଼ୀ କରେ । ରୋଡେଲା ଶିଥାକେ ଏମନ ଆଚରଣେର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ଜାନତେ ପାରେ ମେ ଆଁକତେ ପାରଛେ ନା । ଏକଥା ଶୁଣେ ରୋଡେଲା ତାକେ ଆଁକତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

৩। রোদেলার প্রতি শিথার হিসাত্মক আচরণের কারণ হলো -

- i. অসহায়তা
 - ii. অপারগতা
 - iii. ইন্ম্যন্যতা

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- ক. i ও ii খ. ii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। শিথার দুষ্কর্মের প্রতিবাদ না করার মধ্য দিয়ে রোদেলার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- | | |
|----------|----------------|
| ক. ক্ষমা | খ. বিদ্যানূরাগ |
| গ. হিংসা | ঘ. অনীহা |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। দিব্যেন্দু ইতিহাসের অধ্যাপক। সকালে পূজাহিক করে তিনি কর্মস্থলে বের হন। তিনি প্রতিদিন পশুপাখিদের খাবার দেন এবং দরিদ্র অসহায়দের প্রচুর দান-ধ্যান করেন। দিব্যেন্দু বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা করেন। সত্য ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও সত্য প্রচারে বিমুখ হন না এবং তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা না হলেও ভেঙে পড়েন না। এ সকল কারণে তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হন।

- ক. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা কোন শাস্ত্রের অঙ্গবৃক্তি?
- খ. জীবঃ ব্রহ্মের নাপরঃ - শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।
- গ. দিব্যেন্দুর আচরণিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবার কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দিব্যেন্দুর দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ‘সৎকর্ম কখনও বিফলে যায় না’ – পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। রিদিমা প্রতিদিন পূজা করার সময় প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। পূজা শেষে বাবা-মাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করে। গুরুজনদের প্রতিও সে শ্রদ্ধাশীল। সে কখনও কারো সাথে অসদাচরণ করে না এবং ছোট ভাইবোনদেরকেও অত্যন্ত আদর-যত্ন করে। তাই সে পরিবার ও প্রতিবেশীসহ সকলের কাছেই প্রিয়। মানুষের প্রতি রিদিমার এ আচরণ সমাজের মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে।

- ক. তন্ত্রসার কী?
- খ. আমরা দেবতাদের স্তব-স্তুতি করি কেন?
- গ. বর্ণিত অনুচ্ছেদে রিদিমার চরিত্রে কোন শিক্ষার প্রতিফলন প্রতিভাব হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রিদিমার দৃষ্টান্তই স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম’- কথাটি মূল্যায়ন কর।

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅବତାର ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଚାରିତ

ଅବତରଣ କରେନ ସିନି ତିନିଇ ଅବତାର । ତବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ ସେ-କାଉକେଇ ଅବତାର ବଲା ହୁଯନି । ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସଥିନ ଜ୍ଞାନର କଳ୍ୟାପେର ଜନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ବୈକୁଞ୍ଜ ଥେକେ ଶୃଦ୍ଧିବୀତେ ଅବତରଣ କରେନ, ତଥିନ ତାଙ୍କେ ବଲା ହୁଏ ଅବତାର । କାଜ ଶେଷ ହୁଲେ ତିନି ଆବାର ସଜ୍ଜାନେ କିମ୍ବେ ଯାନ । ବିଷ୍ଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଯେହେନ । ସେ-ସବେର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟାଦୀ ଦଶ ଅବତାର ବିଧ୍ୟାତ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆମରା ଲିଚେର କ୍ଲାସେ ଜେନେହି । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଅବତାରେର ଧରନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଅବତାରରୂପେ ଆବିର୍ଭାବେର କାରଣ ଜାନତେ ପାରିବ ।

ଅବତାର ଛାଡ଼ାଏ ସୁଗେ-ସୁଗେ ଏଥିନ କିଛୁ ମନୀଷୀ ଜନ୍ମାନ୍ତରଣ କରେଛିଲେ, ଯାରୀ ଆଜୀବନ ମାନୁଷେର କଳ୍ୟାପ କରେ ଗେହେନ । ତାଦେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନେ କୋଣେ ଚାନ୍ଦା-ପାନ୍ଦା ଛିଲ ନା । ଅକାତରେ ତାରା ମାନବ କଳ୍ୟାପେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେଛେନ । ସେ-ସବ ମହାପୂର୍ବ ଓ ମହୀୟସୀ ନାରୀଦେର ଜୀବନରେ ଆମାଦେର ଲିକଟ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଚାରିତ । ଲିଚେର କ୍ଲାସେ ଆମରା ବେଶ କରେକରିବି ମହାପୂର୍ବ ଓ ମହୀୟସୀ ନାରୀର ଜୀବନୀ ପଡ଼େଛି । ଏଥାନେ ଆମରା ଆରୋ କରେକରିବି ଜୀବନୀ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଦେର ଜୀବନୀ ଥେକେ ଅନେକ କିଛୁ ଶିଖିବି ପାରିବ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା—

- ଅବତାରେର ଧାରଣା ଓ ଏର ଧରନ (ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଓ ଅଂଶାବତାର) ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ପାରିବ ।
- ଅବତାରରୂପେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଆବିର୍ଭାବେର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ପାରିବ ।
- ଚିକିତ୍ସା ବିଜାନେ ଚରକ ଓ ସୁନ୍ଦରତର ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ପାରିବ ।
- ଧୟୀୟ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଲୈତିକ ଜୀବନ ପଠିବି ଶ୍ରୀଶକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର ମତାଦର୍ଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ପାରିବ ।
- ଧୟୀୟ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଲୈତିକ ଜୀବନ ପଠିବି ମୀରାବାଦୀ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାର ମତାଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ପାରିବ ।



- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নেতৃত্ব জীবন গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শ শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও নেতৃত্ব জীবন গঠনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : অবতার

আগেই বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার। অবতাররূপে তিনি জগতের কল্যাণ করেন। পৃথিবী সব সময় এক রকম থাকে না। পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা দুষ্ট লোকের জন্ম হয়। তারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে। এতে জগতে শোক, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। শিষ্টদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমনি সময়েই ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে আবির্ভূত হন। দুষ্টদের বিনাশ করেন। জগতে আবার শান্তি ফিরে আসে। ভগবানও তাঁর স্বষ্টানে ফিরে যান।

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবের রূপ ধরে অবতরণ করেন। তিনি যখন মানুষরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন। মানুষের মতোই মাতৃগতে জন্ম নেন। মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। তবে তার মধ্য দিয়েও তাঁর কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে। যেহেতু তিনি ভগবান। ভগবান ও মানুষ কখনো এক হতে পারে না।

অবতারের ধরন

অবতার দুই রকমের – পূর্ণাবতার ও অংশাবতার। ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার। কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে ছিল।

ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে বলা হয় অংশাবতার। অংশাবতারে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ থাকে না। অংশাবতার অনেক। তার মধ্যে দশটি প্রধান, যেমন- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বাঘ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কঙ্কি। এঁরা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন। ভগবানের অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-কথা তিনি নিজেই শ্রীমত্তগবদ্ধীতায় বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্বতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাআনং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুষ্টামি যুগে যুগে॥ (৪/৭-৮)

হে অর্জুন, জগতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় এবং অধর্মের উত্থান ঘটে, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সজ্জনদের রক্ষার জন্য, দুর্জনদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। অর্থাৎ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি।

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন খুবই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। এদের অত্যাচারে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এদের বিনাশ করে শান্তি স্থাপন করেন। ১০

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୟାଯପରାଯଣତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛେ । ଦୁଷ୍ଟେର କାହେ ତିନି ଭୟକ୍ଷର, ସଜ୍ଜନେର କାହେ ଶାନ୍ତିର ସୌମ୍ୟ କାନ୍ତିଧାରୀ, ଭକ୍ତେର କାହେ ଭଗବାନ ।

ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଚାରିତ

ପାଠ ୨ : ସୁଶ୍ରୁତ

ସୁଶ୍ରୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେର ଏକଜନ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ଛିଲେନ । ତା'ର ପିତାର ନାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ।

ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକଦିନ ଅର୍ତ୍ତବାସୀକେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରହ ଦେଖେ ଦେବବୈଦ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ କାନ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରର କଥାମତେ ଧ୍ୟାନକୁ କାନ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପୁଅରାପେ ଦିବୋଦାସ ନାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏ-କଥା ଜାନତେ ପେରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସୁଶ୍ରୁତକେ ତା'ର ନିକଟ ପାଠାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ । ସୁଶ୍ରୁତ ଦିବୋଦାସେର ନିକଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିଖେ ଚିକିତ୍ସା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକଥାନା ଗ୍ରହ୍ଣ ରଚନା କରେନ । ତା'ର ନାମ ଅନୁମାରେ ଗ୍ରହ୍ଣେର ନାମ ହ୍ୟ ‘ସୁଶ୍ରୁତ’ ବା ‘ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତା’ ।

ଆଧୁନିକ ଗବେଷକଦେର ମତେ ସୁଶ୍ରୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୦୦ ଅବେଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଲେନ । ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରାଣସୀ ନଗରେ ଗଞ୍ଜାର ତୀରେ ବାସ କରତେନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚା କରତେନ । ତିନି ପ୍ରଧାନତ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଚର୍ଚା କରତେନ । ଏଜନ୍ୟ ତା'କେ ବଲା ହ୍ୟ ‘ଭାରତୀୟ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଜନକ’ । ତିନି ତା'ର ଗ୍ରହ୍ଣେ ଶଲ୍ୟବିଦ୍ୟାର ୩୦୦ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ୧୨୦ଟି ଅନ୍ତେର ବର୍ଣନା ଦିଯେଛେ । ପାଞ୍ଚାନ୍ତେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗୁଲୋର ଆଧୁନିକାଯନ କରା ହେବେ ।

ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତା ପ୍ରଧାନତ ଚାରଟି ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ – ସୂତ୍ରାନ୍ତ, ଶାରୀରାନ୍ତାନ, ଚିକିତ୍ସିତାନ୍ତାନ ଏବଂ କଲ୍ପାନ୍ତାନ । ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦେର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଶଲ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ, ରସାୟନତତ୍ତ୍ଵ, ପୀଡ଼ା, ଔଷଧ, ଅଷ୍ଟି, ଚିକିତ୍ସା, ରୋଗେର ଲକ୍ଷଣ, ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଶ୍ଵାରିତଭାବେ ବର୍ଣନା କରା ହେବେ । ଆୟୁର୍ବେଦମତେ ଚିକିତ୍ସା କରତେ ହେଲେ ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତାଯ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥାକିତେ ହ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତେ ଏର ବିଶେଷ ଶୁରୁତ୍ୱ ରହେଛେ । ତାଇ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେ ବ୍ୟୁତପତ୍ତି ଲାଭ କରତେ ହେଲେ ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତାଯ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା ପ୍ରୋଜନ । ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତା ରଚନା କରେ ସୁଶ୍ରୁତ ମାନବ ଜାତିର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେଛେ ।

ପାଠ ୩ : ଚରକ

ଚରକ ଛିଲେନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେର ଏକଜନ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ । ତା'କେ ‘ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେର ଜନକ’ ବଲା ହ୍ୟ । ତା'ର ସମ୍ପର୍କେ ଶାନ୍ତ୍ରେ ବଲା ହେବେ ଯେ, ବିଷ୍ଣୁ ଯଥନ ମର୍ଦ୍ସ୍ୟାବତାରରାପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ, ତଥନ ଅନନ୍ତଦେବ ଅର୍ଥବୈଦ୍ୟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଲାଭ କରେନ । ଏରପର ତିନି ମାନୁଷେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନ କରେନ । ଦେଖେ, ଅନେକେଇ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରହ ହ୍ୟେ ବେଦନାୟ କାତର । ତା ଦେଖେ ତିନି ଭୀଷଣ କଟ୍ ପାନ । ତାଇ ମାନୁଷେର କଟ୍ ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଏକଜନ ମୁନିପୁଅରାପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଚରରାପେ ପୃଥିବୀତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ବଲେ ତା'ର ନାମ ହ୍ୟ ଚରକ । ଆଧୁନିକ ଗବେଷକଦେର ମତେ ଚରକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦ ଅବେଳା ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ।

ଚରକ ମାନୁଷେର ଚିକିତ୍ସା ଶୁରୁ କରେନ । ଅନ୍ତଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତିନି ଏକଜନ ସୁଚିକିତ୍ସକ ହିସେବେ ଥ୍ୟାତି ଲାଭ କରେନ । ତା'ର ପୂର୍ବେ ଆତ୍ରେୟ, ଆଯିବେଶ ପ୍ରମୁଖ ଆରୋ ଚିକିତ୍ସକ ଛିଲେନ । ତା'ରା ବୈଦ୍ୟକ ବା ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହ୍ଣ ରଚନା କରେଛି । ଚରକ ସେ-ସବେର ସଂକ୍ଷାର ଓ ସାରାଂଶ ଗ୍ରହ୍ଣ କରେ ଏକଥାନା ନତୁନ ଗ୍ରହ୍ଣ ପ୍ରଣୟନ କରେନ । ତା'ର

ନାମ ‘ଚରକସଂହିତା’ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହି ଏକଖାନା ବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରହ୍ତ । ଗ୍ରହ୍ତଟି ଆଟଟି ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ - ସୂତ୍ରାଶାନ, ନିଦାନାଶାନ, ବିମାନାଶାନ, ଶାରୀରାଶାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶାନ, ଚିକିତ୍ସାଶାନ ଓ ସିଦ୍ଧିଶାନ ।

ଚରକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମାନବ ଦେହର ପରିପାକ, ବିପାକ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ । ତିନି ଶରୀରେର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଜନ୍ୟ ତିନଟି ‘ଦୋଷ’ ବା ଉପାଦାନେର କଥା ବଲେଛେ । ସେଗୁଳେ ହଲୋ - ବାତ, ପିଣ୍ଡ ଓ କଫ । ଏହି ତିନଟିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଲେ ଶରୀର ଅସୁଖ ହୁଏ । ଆର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଫିରେ ଏଲେ ଶରୀର ସୁଖ ହୁଏ । ଚରକ ଏ-ଓ ବଲେଛେ- ରୋଗେର ଚିକିତ୍ସାର ଚେଯେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ବେଶି ଜରଣି । ତିନି ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସାର ପୂର୍ବେ ରୋଗେର କାରଣମୂଳ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କେ ଯଥାର୍ଥରୂପେ ଭାବତେ ବଲେଛେ ।

ଚରକ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେନ । ଏମନକି ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କାରଣମୂଳ୍ୟ ତିନି ଜାନତେନ । ମାନବ ଦେହର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କେ ତାଁର ଧାରଣା ଛିଲ । ତିନି ମାନବ ଦେହେ ଦାଁତସହ ୩୬୦ଟି ଅଣ୍ଠିର କଥା ବଲେଛେ । ହରପିଣ୍ଡକେ ବଲେଛେ ଦେହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର । ୧୩ଟି ପଥେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସମଗ୍ର ଶରୀରେ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଯ ଏ ଗ୍ରହ୍ତେର ଶୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ । ଚରକସଂହିତା ରଚନା କରେ ଚରକ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେଛେ ।

ସୁଶ୍ରୁତସଂହିତା ଏବଂ ଚରକସଂହିତା ଉଭୟ ଗ୍ରହ୍ତାଙ୍କ ଖଲିଫା ଆବାସୀର ସମୟ ଆରବି ଭାଷାଯ ଅନୁଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଇଉରୋପେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ । ଏର ଫଳେ ଇଉରୋପେର ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାରତବର୍ଷେ ଏସେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସାବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେନ ।

ପାଠ ୪ ଓ ୫ : ଶ୍ରୀଶକ୍ରାଚାର୍ୟ

ଦାଙ୍କିଣାତ୍ୟେର କେରଳ ରାଜ୍ୟ କାଲାଡି ନାମେ ଏକ ଗ୍ରାମ । ଏହି ଗ୍ରାମେ ୭୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେର ବୈଶାଖୀ ଶୁକ୍ଳା ପଦ୍ମମୀ ତିଥିତେ ଶକ୍ରାଚାର୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାଁର ପିତାର ନାମ ଶିବଗୁରୁ ଏବଂ ମାତାର ନାମ ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ । ଶିବଗୁରୁ ଛିଲେନ ଏକଜନ ଶାନ୍ତିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିବଭକ୍ତ ।

ଶକ୍ରରେର ଛିଲ ଅସାଧାରଣ ମେଧା ଓ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି । ତା ଦେଖେ ପିତା ଶିବଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵିତ ହନ । ତିନି ତିନ ବହୁ ବୟସ ଥେକେଇ ପୁତ୍ରକେ ପଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରେନ । ତାଁର ଏକାନ୍ତ ବାସନା, ପୁତ୍ରକେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ସୁପାଞ୍ଜିତ କରେ ତୁଳବେନ । କିନ୍ତୁ କିଛୁ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ତାଁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ତାରପର ପ୍ରାଚୀ ବହୁ ବୟସେ ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ ଛେଳେର ଉପନୟନ ଦେନ । ଉପନୟନରେ ପର ଶାନ୍ତିଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ତାଁକେ ଶୁରୁଗୁରୁ ପାଠାନୋ ହୁଏ । ସେଥାନେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବହୁରେ ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ରର ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ପାଞ୍ଚିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେନ । ସାତ ବହୁ ବୟସେ ବାଡି ଫିରେ ଆସେନ । ବାଡି ଫିରେ ତିନି ଏକଟି ଟୋଲ ଖୁଲେ ଛାତ୍ର ପଡ଼ାତେ ଶୁରୁ କରେନ । ହାନୀଯ ପଞ୍ଚିତରା ପ୍ରଥମେ ତୁଚ୍ଛ-ତାଚିଲ୍ୟ କରତେ ଲାଗଲେନ । ସାତ ବହୁରେ ବାଲକ କୀ ପଡ଼ାବେ? କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଶକ୍ରରେ ପାଞ୍ଚିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପେଯେ ସବାଇ ତାଁ ନିକଟ ମାଥା ନତ କରେନ ।

ଶକ୍ରରେ ପାଞ୍ଚିତ୍ୟର ଖ୍ୟାତି ଚାରଦିକେ ଛାଇଯେ ପଡ଼େ । ଏକ ସମୟ କେରଳେର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରେର କାନେଓ ଯାଯ ଏ-କଥା । ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀକେ ପାଠାନ ଶକ୍ରରକେ ରାଜସଭାଯ ନିଯେ ଯେତେ । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ରର ବିନ୍ଦୟେ ସଙ୍ଗେ ବଲେନ, ତିନି ବିଦ୍ୟା ବିତରଣ କରବେନ । ବାଲକ ଶକ୍ରରେ ଏହି ତେଜୋଦୃଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣେ ରାଜା ବିଶ୍ଵିତ ହନ । ତିନି ନିଜେ ଚଲେ ଆସେନ ଶକ୍ରରେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ । ତାଁର ସଙ୍ଗେ

କଥା ବଲେ ରାଜା ତାଁର ପାଣିତ୍ୟେର ଗଭୀରତା ବୁଝାତେ ପାରେନ । ତାଇ ରାଜା ହୋଇ ଏହି ଅସାଧାରଣ ବାଲକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କେ ପ୍ରଗାମ କରେ ତିନି ସହ୍ୟ ସର୍ଗମୁଦ୍ରା ଦାନ କରେନ । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତର ତାର ଏକଟିଓ ସ୍ପର୍ଶ କରେନ ନି । ସବ ଦରିଦ୍ରଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଶିଷ୍ଟେ ଦିଲ୍ଲେହେନ ।

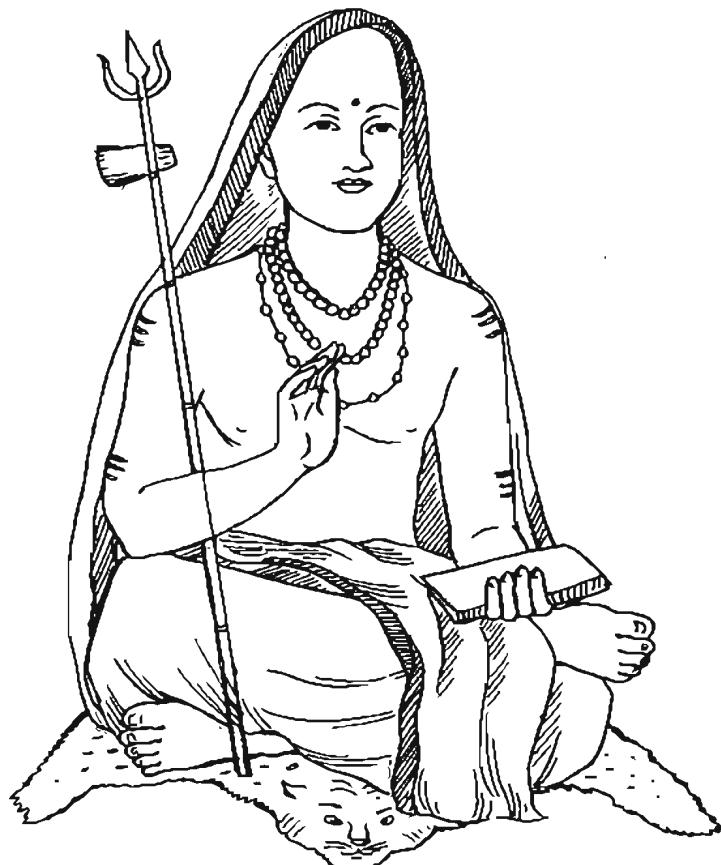
ଶକ୍ତରେର ପାଣିତ୍ୟେର କଥା ତଥା ତନେ ଏକଦିନ କରେକଞ୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ତାଁର ବାଡ଼ିତେ ଆସେନ । ତାଁରା ଶକ୍ତରେର ସଜେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଙ୍କାଳାପ କରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ହନ । ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ମା ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ ପଣ୍ଡିତଦେର ଅନୁରୋଧ କରେନ ଶକ୍ତରେର କୋଣ୍ଠୀ ଦେଖିବେ । ପଣ୍ଡିତରା କୋଣ୍ଠୀ ଦେଖେ ବଲେନ, ଶକ୍ତରେର ଆୟୁ ଖୁବି ସ୍ଵର୍ଗ । ସେଇ ଅଧିବା ବତ୍ରିଶ ବର୍ଷରେ ତାଁର ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ଆଛେ । ଏ-କଥା ତନେ ବିଶିଷ୍ଟା ଦେବୀ କାନ୍ଦାଯ ଭେଣେ ପଡ଼େନ । ତାଁର ଏକମାତ୍ର ଅବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତରକେ ଏତ ଅଳ୍ପ ବୟସେ ହାରାତେ ହବେ ।

ଶକ୍ତର ଏ-କଥା ଶୁଣିଲେନ । ତିନି ମାକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସିଲେନ । ଟୋଲେର ଛାତଦେର ପଡ଼ାନୋର ଅବସରେ ଯେ ସମୟଟକୁ ପେତେନ, ତଥନ ତିନି କେବଳ ମାଯେର ସେବା କରାନେନ । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ତନେ ତାଁର ଭେତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ଜୀବନ ଓ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କେ ତିନି ନନ୍ଦନ କରେ ଭାବତେ ଲାଗିଲେନ । ତିନି ଭାବିଲେନ, ମୋକ୍ଷଲାଭିଷ୍ଟ ମାନୁଷେର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତାଇ ବ୍ରହ୍ମ-ସାଧନାୟ ତିନି ବାକି ଜୀବନ କାଟିଯେ ଦେବେନ ।

ଏକଦିନ ଶକ୍ତର ମାକେ ତାଁର ମନେର କଥା ଖୁଲେ ବଲେନ । କିନ୍ତୁ ମା କିଛିତେଇ ରାଜି ହନ ନା । ଅବଶେଷେ ଶକ୍ତର ଅନେକ ବୁଝିଯେ ମାକେ ରାଜି କରାଲେନ ।

ତିନି ଏ-ଓ ବଲିଲେନ, ସେଖାନେଇ
ଥାକେନ-ନା-କେନ, ମାଯେର ଅତିମ
ସମୟେ ତିନି ପାଶେ ଉପହିଁତ
ଥାକିବେନ । ଏହି ବଲେ ଶକ୍ତର ଏକଦିନ
ଗୃହତ୍ୟାଗ କରେନ ।

ଶକ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାସ ନେବେନ । ତାଇ ଶୁରୁର
ମନ୍ଦିର କରାଇଲେ । ଦୁଇ ମାସ
କ୍ରମାଗତ ପଥ ଚଲାତେ ଚଲାତେ ତିନି
ଉପହିଁତ ହନ ଓ ଶକ୍ତାରନାଥେର
ଦୀପଶିଳେ । ସେଖାନେ ଦେଖା ପାଇ
ମହାୟୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦପାଦେର । ତାଁର
ନିକଟ ତିନି ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଧର୍ମେ ଦୀକ୍ଷା
ନେନ । ତିନ ବହୁ ଶୁରୁର କାହେ
ଥେକେ ତିନି ଯୋଗସିଦ୍ଧି ଓ
ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଆୟନ୍ତ କରେନ । ତାମପର
ଶୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଚଲେ ଯାନ
ହିମାଲୟେର ନିଭୃତ ଧାମ ବଦରିକା
ଆଶ୍ରମେ । ସେଖାନେ ତିନି
ବେଦାନ୍ତଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଛୁ ରଚନାୟ



মনোনিবেশ করেন। যোল বছর বয়সের মধ্যেই তিনি গুরুর নির্দেশিত গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন।

এর পর ধর্মগুরু হিসেবে গুরু হয় শঙ্করের নতুন জীবন। তাঁর অনেক শিষ্যও জুটে যায়। তিনি তখন আচার্য নামে খ্যাত। শঙ্করাচার্য। বদরিকাশ্রম থেকে তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন। সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা ‘অদৈতবাদ’। তিনি বলেন, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।’

শঙ্করের এই মতবাদ প্রথমে অনেকেই মানতে চান নি। কিন্তু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বাগ্ধৃতার কাছে সবাই হার মানেন। তাঁর মতবাদ মেনে নেন। তিনি একে একে কুমারিল ভট্ট, মণি মিশ্র প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করেন।

শঙ্কর তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। তিনি ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে (বদরিকাশ্রমে) যোশী মঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর চারজন শিষ্যকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য ও হস্তামলকাচার্য। শঙ্করাচার্য বিভিন্ন দলীয় সন্ন্যাসীদের এই সব মঠে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। এটা তাঁর একটি উজ্জ্বল কীর্তি।

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও স্নান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য তাঁর অদৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কেনো পার্থক্য নেই – একথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তুব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থে রচনা করে গেছেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এত অসাধারণ কাজ করে আচার্য শঙ্কর উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে ইহলীলা সংবরণ করেন। তার আগে অবশ্য তিনি মায়ের অস্তিম শয্যায় উপস্থিত ছিলেন, যেহেতু তিনি মাকে কথা দিয়েছিলেন।

শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর কাব্য থেকে কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো:

১. কে তব কাস্তা আৱ কে তব কুমাৰ?

অতীব বিচিত্র এই মায়াৰ সংসাৰ।

কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহাৰ,

ভাৱ কৰহ ভাই, এই তত্ত্ব সার।

২. পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,

জীবন তেমন হয় অতীব চপল।

ଜାନିଓ କରେଛେ ଗ୍ରାସ ବ୍ୟାଧି ବିଷଧର,
ସମନ୍ତ ସଂସାର ତାଇ ଶୋକେ ଜରାଜର ।

୩. ଦିବସ ଯାମିନୀ ଆର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାତ,
ଶିଶିର ବସନ୍ତ ପୁନଃ କରେ ଯାତାଯାତ ।
ଏଇ ରୂପେ ସେଲେ କାଳ କ୍ଷୟ ପାଇ ଆୟ,
ତଥାପି ମାନବ ନାହିଁ ଛାଡ଼େ ଆଶା-ବାୟ ।

୪. ସତଦିନ କରେ ନର ଧନ ଉପାର୍ଜନ,
ତତଦିନ ସାକେ ବଶେ ନିଜ ପରିଜନ ।
ପରେ ସବେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଯ ଦେହ,
ଡେକେଓ ଜିଞ୍ଜାସା ସରେ ନାହିଁ କରେ କେହ ।

ପାଠ ୬ ଓ ୭ : ଅଭ୍ୟାସନାମଦ୍ରି

୧୪୭୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଭାରତେର ପଚିମବଙ୍ଗେର ବୀରଭୂମ ଜେଲାର ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମେ ଅଭ୍ୟାସନାମଦ୍ରି ଜନ୍ମଗତି କରେନ । ତାଁର ପିତାର ନାମ ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମାତାର ନାମ ପଞ୍ଚାବତୀ । ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ ଛିଲେନ ଏକଜନ ସଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ପୈତୃକ ବିଷୟ-ସମ୍ପଦି ଏବଂ ସଜନ-ସାଜନେର କାଜ ମିଳିଲେ ତାଁର ସଂସାରଟି ଛିଲ ବେଶ ସାହ୍ରଦୀ ।

ନିଯାନଦେର ଅକୃତ ନାମ ଛିଲ କୁବେର । ଆମେର ପାଠଶାଳାଯ ପିତା ତାଁର ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । ଛାତ୍ର ହିସେବେ ତିନି ମେଧାବୀ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ାଶୋନାଯ ତାଁର ଏକଦମ ମନ ଛିଲ ନା । ତାର ଚେଯେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ତାଁର ଅନୁରାଗ ଛିଲ ବେଶ । ଧର୍ମକଥା ଶୁଣିବା କାହାର କାଜରେ ନାହିଁ । ପାଢ଼ାର ଛେଲେଦେର ସଙ୍ଗେ ତିନି ଖେଳାଖୁଲା କରନେନ ବଟେ, ତବେ ଖେଳାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋନୋ ମନ୍ଦିରେ ଗିଯେ ବସେ ଧାକତେ ତାଁର ବେଶ ଭାଲୋ ଲାଗନ୍ତ । ତାଁର ଏଇ ଧର୍ମାନୁରାଗେର ମୂଳେ ଛିଲେନ ଡଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । କୁବେର ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ କଥାଇ ଭାବନେନ । କୀଭାବେ ତାଁକେ ପାଓଯା ଯାଇ - ଏହି ଛିଲ ତାଁର ସାରାକ୍ଷଣେର ଭାବନା । କୋନୋ ସାଧୁ- ସନ୍ନୟସୀକେ ଦେଖିଲେଇ ତିନି ତାଁକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରନେନ କୀ କରଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ପାଓଯା ଯାବେ ।

କୁବେରେର ବୟବସ ତଥନ ବାରୋ ବହର । ଏକଦିନ
ଏକ ସନ୍ନୟସୀ ଏଲେନ ତାଁଦେର ଗୌରେ । ଉଠିଲେନ
ତାଁଦେଇ ବାଡ଼ି । ତିନି ବୃଦ୍ଧାବନେ ଯାବେନ ।
କୁବେର ଶୁଣେଛେ ବୃଦ୍ଧାବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
ଶୀଳାକ୍ଷେତ୍ର । ତାଇ ତିନି ଭାବଲେନ, ବୃଦ୍ଧାବନ
ଫର୍ମା-୧୭, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା-୧୩-୧୦ୟ



গেলে হয়তো তাঁর প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। কুবের সন্ন্যাসীকে তাঁর মনের কথা বললেন। সন্ন্যাসী বললেন, ‘এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেয়া ঠিক নয়। তাছাড়া সন্ন্যাস নিতে হলে পিতা-মাতার সম্মতি লাগে।’

কিন্তু কুবের নাছোড়বান্দা। তিনি বৃন্দাবনে যাবেনই। অগত্যা পিতা-মাতার সম্মতি নিয়ে তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বছরের পর বছর কেটে গেল। হঠাতে একদিন কুবের সন্ন্যাসীকে হারিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি একাই বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন তাঁর কাঞ্জিত বৃন্দাবনে। এখানে এসে কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তাঁর সাক্ষাৎ হয় পরম সন্ন্যাসী শ্রীগোবিন্দপুরীর সঙ্গে। তাঁর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন। গুরুর সঙ্গে কিছুদিন বৃন্দাবনে থেকে কুবের আবার বেরিয়ে পড়েন তীর্থ পর্যটনে। একা একা বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়ান। এ সময় তিনি রামেশ্বর, নীলাচল, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতা তাঁর ক্রমশই বাড়তে থাকে। তাঁর একটাই চিন্তা – কৃষ্ণদর্শন কীভাবে হবে। তাই তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

কুবের সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন। কীভাবে কখন কৃষ্ণদর্শন হবে – এই তাঁর একমাত্র ভাবনা। এই ভাবনায় তাঁর দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাতে একদিন তিনি কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন। কৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, ‘তুমি গৌড় দেশে নবদ্বীপে যাও। সেখানে নিমাই পঙ্গিত আচগালে প্রেমভক্তি প্রচার করছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দাও।’ উল্লেখ্য যে, এই নিমাই পঙ্গিতই শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত।

এভাবে স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন হওয়ায় কুবেরের মন অনেকটা শান্ত হয়। স্বপ্নে হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছেন। তাই তাঁর আদেশে তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুজন দুজনকে চিনতে পারেন, বুবতে পারেন। তাঁরা দুয়ে মিলে যেন এক। জীবোদ্ধারের জন্য যেন দুই দেহে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন থেকে কুবেরের নতুন নাম হলো নিত্যানন্দ। সংক্ষেপে নিতাই। আর গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত নাম গৌর। ভজরা সংক্ষেপে বলতেন গৌর-নিতাই।

গৌর-নিতাই দুজনে নবদ্বীপে প্রেমভক্তি প্রচার করতে লাগলেন। নেচে-গেয়ে তাঁরা হরিনাম বিলাতে লাগলেন। তাঁদের প্রেমধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই। উঁচু-নীচু নেই। তখন সমাজে শুক্ষ ধর্মাচারণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। মানবপ্রেম তার নীচে চাপা পড়েছিল। তাই প্রেমভক্তি দিয়ে গৌর-নিতাই সমাজের সবাইকে কাছে টেনে নিলেন। ফলে দলে-দলে সোক তাঁদের অনুসারী হলো।

কিন্তু বৈষ্ণববিদ্঵েষীরা গৌর-নিতাইয়ের এই প্রেমধর্ম প্রচারে বাধা দিতে লাগলেন। কখনো কখনো তাঁদের ওপর আক্রমণও চালান।

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তখন নবদ্বীপে জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই ভাই নগর কোতোয়ালের কাজ করতেন। লোকে তাঁদের বলত জগাই-মাধাই। তাঁরা ছিলেন মদ্যপ এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। যখন যা খুশি তা-ই করতেন। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করত না। নিত্যানন্দ এ-কথা জানতে পারলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে বললেন, ‘জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে হবে।’ প্রভু মৌন সম্মতি দিলেন।

তারপর একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস কৃষ্ণনাম করতে করতে পথ দিয়ে ফিরছেন। হঠাতে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা। মদ খেয়ে তখন তাঁরা মাতাল। কৃষ্ণনাম শুনে তাঁরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মাধাই একটা ভাঙ্গা কলসির কানা ছুঁড়ে মারলেন নিতাইয়ের দিকে। মাথায় লেগে কেটে গেল। দরদর করে রঞ্জ পড়তে লাগল। কিন্তু নিত্যানন্দ এক হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কৃষ্ণনাম গেয়েই চললেন। এতে মাধাই আরো ক্ষেপে গিয়ে আবার নিতাইকে মারতে গেলেন। কিন্তু জগাই তাঁকে আটকালেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন পথচারী সেখানে জড় হয়েছেন। নিতাইয়ের অবস্থা দেখে তাঁদের মায়া হলো। কিন্তু জগাই-মাধাইয়ের ভয়ে কেউ কোনো কথা বলল না।

ঘটনাটি শ্রীগৌরাঙ্গের কানেও গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দল-বল নিয়ে ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। জগাই-মাধাইকে তিনি কঠোর দণ্ড দেবেন। নিত্যানন্দ তখন এগিয়ে এসে বললেন, ‘প্রভু, জগাইয়ের কোনো দোষ নেই। সে আমাকে রক্ষা করেছে। মাধাইও ভুল করে এ-কাজ করেছে। তুমি এদের ক্ষমা করে দাও।’

নিত্যানন্দের কথা শুনে গৌরাঙ্গ অনেকটা শাস্ত হলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে জগাইকে বুকে টেনে নিলেন। তা দেখে মাধাইয়ের মনে অনুশোচনা এল। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, ‘প্রভু, আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করে দাও।’ গৌরাঙ্গ বললেন, ‘নিতাই যদি তোমায় ক্ষমা করে তাহলে তুমি ক্ষমা পাবে।’ এরপর মাধাই জোড়হাতে এগিয়ে গেলেন নিত্যানন্দের দিকে। নিত্যানন্দ তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এভাবে গৌর-নিতাই তাঁদের প্রেমভক্তি দিয়ে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করলেন। উপস্থিত লোকজন সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল। এভাবে গৌর-নিতাই নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম কীর্তন ও প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতে লাগলেন। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করতে লাগল। এমন সময় একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ধ্যাস নিয়ে নীলাচলে গেলেন। নিত্যানন্দও সঙ্গে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর গৌরাঙ্গ একদিন বললেন, ‘নিত্যানন্দ, গৌড়ে এখন একদিকে চলছে শক্তি বা তত্ত্বসাধনা, অন্যদিকে চলছে নব্যন্যায়ের যুক্তিসর্বশ জ্ঞানতত্ত্বচর্চা। ধর্মপিপাসু সাধারণ মানুষ কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন। তুমি সেখানে গিয়ে সংসারী হও এবং বিদ্বান, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চঙ্গাল, ধনী, দরিদ্র সকলের মধ্যে হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ কর। সকলকে এক কৃষ্ণনামে আবদ্ধ কর।’

একথা শুনে নিত্যানন্দের মাথায় যেন বজ্জ্বাত হলো। তাকে প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু প্রভুর আদেশ। মানতেই হবে। তাই নিত্যানন্দ গৌড়ে ফিরে এলেন এবং কালনার অধিবাসী সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহুবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের নিয়ে তিনি খড়দহে সংসার পাতেন। বসুধার পুত্র বীরভদ্র। জাহুবীর কোনো সন্তান না থাকায় তিনি এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রামাই গোস্বামী। খড়দহের গোস্বামীরা এঁদেরই বংশধর। নিত্যানন্দ ধারার গোস্বামীরা গৌড়দেশের সমাজজীবনে বেশ কিছুকাল ধরে প্রেমধর্মের প্রসার ঘটান।

গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গোড়রাজ্যে, বিশেষত নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনামের পাশাপাশি তিনি কীর্তন করতেন:

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সে হয় আমার থ্রাণ।

এভাবে তিনি কৃষ্ণনামের সঙ্গে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরণপে গোড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। ধর্মতত্ত্বের কোনো বিচার-বিশ্লেষণ বা তর্ক-বিতর্ক নেই, আচার-অনুষ্ঠানের কোনো বাড়াবাড়ি নেই, শুধু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ আর কৃষ্ণনামগান। এভাবে প্রেমভক্তি আর কৃষ্ণনাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি অনেক পাপী-ভাপীকে উদ্ধার করেছেন। সকলকে কৃষ্ণভক্তরূপে ভালোবেসেছেন। তাঁর এই জীবোদ্ধারের কথা সারা গোড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দলে-দলে লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকে। এর ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ জীবনে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সকলে সমস্ত রকম তেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গোড়বাসীর অন্তরে। ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহাসাধক ইহলীলা সংবরণ করেন।

পাঠ ৮ : মীরাবাঈ

ভারতের রাজস্থানে কুড়িকি নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঠোর বংশে মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রত্নসিংহ ছিলেন মেড়তার অধিপতি রাও দুধাজীর পুত্র। মা বীর কুঁয়রী ছিলেন ঝালাবংশীয় রাজপুত্র শূরতান সিংহের কন্যা। রত্নসিংহ কুড়িকি অঞ্চলে বারোখানা থামের জায়গির পেয়ে সেখানেই গড় নির্মাণ করে বাস করতেন।

মীরা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই খুব আদর-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ফলে তাঁর জীবনে একটা ছন্দপতন ঘটে। পিতা রত্নসিংহ মেয়েকে নিয়ে অনেকটা বিপদে পড়েন। তখন পিতামহ রাও দুধাজী মীরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরম যত্নে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন।

দুধাজী নিজে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। মেড়তার প্রাসাদের পাশে ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজজীর মন্দির। তিনি নিয়মিত সেখানে পূজার্চনা করতেন। মাঝে মাঝে মীরাও সেখানে যেতেন। মন্দিরের পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত শান্তালোচনা করতেন। মীরা আগ্রহভরে তা শুনতেন। পিতামহ দুধাজীও মাঝে মাঝে তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি শোনাতেন।

এর ফলে ছোটবেলা থেকেই ধর্মজীবনের একটা আদর্শ মীরার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। বালিকা বয়সেই মীরা ভঙ্গিরসাত্ত্বক ভজন রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। চতুর্ভুজজীর মন্দিরের দেয়ালে মীরার কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভজন উৎকীর্ণ আছে।

একবার এক সাধু মীরাকে গিরিধারী গোপালের একটি বিগ্রহ দেন। মীরা সেটি প্রাসাদে নিয়ে নিত্য তার সেবা-গৃজা করতেন। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি মীরার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

মীরা ঘোবনে পা দিয়েছেন।
ঝুঁপলাবণ্যে তিনি অনন্য।
পিতামহ দুধাজী নাতনির
বিবাহ ঠিক করলেন। পাত্র চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজ। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘৃহসমারোহে মীরার বিবাহ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন শশুর বাড়ি।

শশুর বাড়িতে কোনো কিছুর অভাব নেই। রাণা সংগ্রামসিংহের মতো শশুর। ভোজরাজের মতো সুযোগ্য স্বামী। অতুল প্রশঞ্চ। অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু এ-সবের প্রতি মীরার কেনো আসক্তি নেই। জীবনে তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু হলো কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ লাভ। তিনি শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন। প্রাসাদে কোনো সাধু-সন্ত এলে ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। একমনে হরিকথা শুনতেন। কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হয়ে নিজের কঢ়েই শুরু করতেন ভজন গান। তাঁর কষ্ট এত মধুর ছিল যে সবাই মন দিয়ে তা শুনত।

ভোজরাজ স্তুর প্রতি ছিলেন উদার ও সহনশীল। তিনি স্তুর মনের কথা বুঝতে পারেন। তাই একটি কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করে সেখানে কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করে দেন। মীরা এতে খুব খুশি হন। স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভঙ্গি বেড়ে যায়। কিন্তু সময় কাটে তাঁর কৃষ্ণভজনে। সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। এতে আত্মীয়-পরিজন ও প্রাসাদের লোকজনের মধ্যে নিন্দা ও সমালোচনা শুরু হয়ে যায়।



ক্রমশ মীরার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। রাজবধূর বেশে তিনি যেন এক সর্বত্যাগিনী তপস্থিনী। দিনে রাতে প্রায় সময়ই তিনি ভজন-পূজনে ব্যস্ত থাকেন। ইষ্টদেব গোপীনাথের জন্য মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকেন। এরপ অবস্থায় ভোজরাজ একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলেন— তোমার প্রাণের বেদনা কোথায়, প্রাণের আকৃতি কী তা খুলে বল। বল, তুমি কী চাও। কী পেলে তুমি সুখী হবে, কিসে শান্তি লাভ করবে তা আমায় বল।

মীরা তখন মধুর কঢ়ে একটি ভজন গেয়ে তার উভর দিলেন:

মেরে ত গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোই
জাঁতে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোই।

অর্থাৎ গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমার কেউ নেই। যার মাথায় ময়ূর-মুকুট তিনিই আমার পতি।

ভোজরাজ স্ত্রীর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনের কথাও বুঝতে পারলেন। তিনি মীরার সাধন-ভজনে সার্বিক সহযোগিতা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজবধূ মীরার কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতার কথা চিত্তোরের সাধারণ মানুষ এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা জেনে গেছেন। তাঁরা মীরাকে রাজমহিমী নয়, বরং ভক্তিসাধিকা মীরাবাঙ্গ বলে জানলেন। মীরার সুমধুর কঢ়ের সঙ্গীত এবং প্রেম সাধনার কথা সমগ্র রাজস্থানেই প্রচারিত হলো।

এ অবস্থায় ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভোজরাজ হঠাতে মারা যান। এর অল্পকাল পরে শুশুর রাণা সংগ্রামসিংহও মারা যান। তখন চিত্তোরের নতুন রাণা হন বিক্রমজিৎ সিং। তিনি মীরার ওপর নানা অত্যাচার করতে থাকেন। তাঁকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর আরাধ্য গিরিধারীর কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শেষপর্যন্ত মীরাবাঙ্গ পিতৃগৃহ মেড়তায় ফিরে যান। সেখান থেকে চলে যান বৃন্দাবনে। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর আচার্য। মীরা তাঁর দর্শন কামনা করেন। কিন্তু আচার্য স্ত্রীলোককে দর্শন দিতে রাজি নন। তখন মীরা বলেন, ‘গোস্বামীজী কি ভাগবতের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? বৃন্দাবনের একমাত্র পূরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আর সকলেই প্রকৃতি। তবে তত্ত্বদর্শী গোস্বামীজী আমাকে দর্শন দিতে এত কুর্ষিত কেন?’

মীরার তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রীত হন এবং মীরার সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলেন। মীরার কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা গোস্বামীকে মুগ্ধ করে।

বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপুত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তাঁর নাম প্রচারিত হয়। রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মীরার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভক্তিপ্রায়ণা মীরাবাঙ্গ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবান প্রাণ্তির পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত ভজন-সঙ্গীত কৃষ্ণপ্রেমের গান, কৃষ্ণের উপাসনা এবং ভগবৎ সাধনার এক নতুন পথ প্রদর্শন করে। এই সঙ্গীতধারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। এই সম্প্রীতি যে মিলনধারায় প্রকাশ লাভ করে, তার নাম ‘ভক্তিবাদ’। হিন্দুধর্মের ভাগবতধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফীবাদে সকল শ্রেণির মানুষকে সমান চোখে দেখা হয়।

অতঃপর একদিন বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে মীরা কৃষ্ণের শৃতিবিজড়িত দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। দ্বারকাধামে এসে রণছোড়জীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই দ্বারকাধামেই তাঁর দেহলীলা সংবরণ হয়।

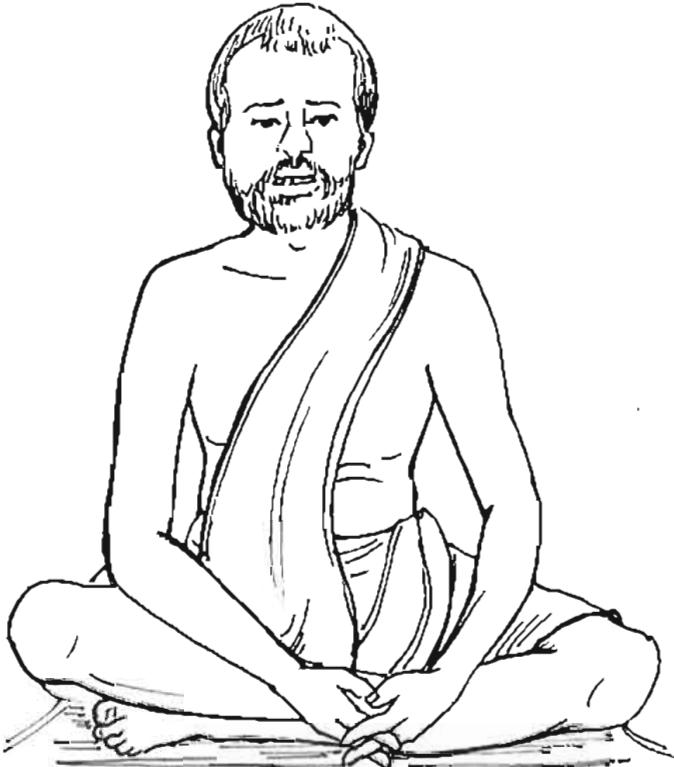
ମୀରାବାଇୟେର ଜୀବନୀ ଥେକେ ଆମରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯେ, ଯୌରା ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ତାଙ୍ଗା ଜାଗତିକ ସବକିଛୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଠେ ଥାନ । ଦୈହିକ କ୍ଲପ-ଜୀବଶ୍ଵର, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ-ଆଶୟ, ସୁଖ-ସାଂଚ୍ଛ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନା । ସବକିଛୁ ହେଡ଼େ ତାଙ୍ଗା କାମ୍ୟ ବନ୍ଧକେ ଲାଭ କରାର ଜନ୍ୟ ଏକାଥିତିରେ ସାଧନା କରେନ । ସେ ସାଧନାମ୍ବୁ ତାଙ୍ଗା ସଫଳ ହନ ।

ପାଠ ୯ ଓ ୧୦ : ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ

'ସକଳ ଧର୍ମି ସତ୍ୟ, ଯତ ମତ ତତ ପଥ', ଅର୍ଥାଏ ଧର୍ମୀଯ ମତ ଓ ପଥ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଓ ସକଳ ମାନୁଷେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗନ୍ଧବ୍ୟ ଏକ - ଈଶ୍ୱର ଲାଭ । ଏହି ପରମ ସତ୍ୟଟି ଯିନି ଉପଲବ୍ଧି କରେଛିଲେନ ତିନି ପ୍ରଥାଗତ ଶିକ୍ଷାଯ ଶିକ୍ଷିତ ଛିଲେନ ନା । ତିନି ଛିଲେନ ବସିକ୍ଷିତ । ଭାରତେର ପରିମବଜେର ହଙ୍ଗମୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ୟ - ୧୮୩୬ ଖ୍ରୀଟୀବେଳେ ୧୭ ଫେବ୍ରୁଆରି । ତାଙ୍କ ପିତାର ନାମ

କୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାତା
ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ । ପିତା-ମାତା ବିଜ୍ଞୁର
ଅପର ନାମାନୁମାରେ ଶିତପୁତ୍ରେର ନାମ
ରାଖେନ ଗଦାଧର । ଏହି ଗଦାଧରଙ୍କ
ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ
ନାମେ ଜଗପ୍ରିୟାତ ହନ ।

ବାଲକ ଗଦାଧର ଦେଖିତେ ଛିଲେନ ଖୁବଇ
ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ । ପ୍ରାକୃତିକ
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ କିମ୍ବା ଆକାଶେ
ଉଦ୍ଭୁତ ବଲାକାର ଝାଁକ ଦେଖେ ଯାଏଁ
ଯାଏଁ ତିନି ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ ।
ଏଟା ଛିଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍ଗବଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।
କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡର ଲେଖାପଢ଼ାୟ ତାଙ୍କ ମନ
ଛିଲ ନା ଏକେବାରେଇ । ତାଇ
ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ
ସମ୍ଭବ ହୟ ନି । ତବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି
ଛିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକର । ଏକବାର କିଛୁ
ଅନଳେଇ ମୁଖ୍ୟ ବଲାତେ ପାରିଲେନ । ଏଭାବେ ତିନି ପିତାର କାହିଁ ଥେକେ ଶେଖେନ ଧର୍ମୀୟ ଶ୍ରୋକ ଓ ସ୍ତବ-ଶ୍ରୋତ, ଆମେର
କଥକଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଶେଖେନ ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତ ଏବଂ ପୁରୀଗାୟୀ ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ମୀଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଶେଖେନ ଧର୍ମଶୀଳି ।
ଭଜନ-କୀର୍ତ୍ତନେର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣ ଛିଲ । ଏଭାବେ ଗଦାଧର ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତି ପାରଦଶୀ
ହେଁ ଓଠେନ ।



গদাধরের অন্ত বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে এক অস্তুত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনও শুশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনও বা নির্জন বাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কোতুহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন। এ অবস্থায় অঞ্জ রামকুমার তাঁকে কোলকাতা নিয়ে যান। সেখানে বামাপুরুরে অবস্থিত নিজের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু গদাধরের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আগের মতোই লেখাপড়ায় তিনি উদাসীন থাকেন।

এমন সময় রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধরও তাঁর সঙ্গে আসেন। মা-কালীর বিগ্রহ এবং পূজার্চনা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হন। তিনি যেন এতদিন এমন একটা কিছুই চেয়েছিলেন। তাই কখনও তিনি মায়ের মন্দিরে ভাবতন্য হয়ে থাকেন, কখনও বা আত্মগ্ন অবস্থায় গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ান।

হঠাতে একদিন অঞ্জ রামকুমারের অকালমৃত্যু হয়। ফলে মায়ের পূজার ভার পড়ে গদাধরের ওপর। মনেগ্রামে তিনি মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। মায়ের পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় প্রায়ই তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। কালক্রমে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্তু সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন, যা অচিরেই তাঁকে ‘আধ্যাত্মিক জননী’ পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বত্র চৈতন্যরূপণী দেবীর দর্শন লাভ করেন।

১৮৫৫ সনে গদাধর মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন। এতে তাঁর কালীসাধনার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এর ছয় বছর পর ১৮৬১ সালে সিদ্ধা তৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর তাঁকে গুরু মানেন এবং তাত্ত্বিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই তৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী এবং অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। তিনি গদাধরকে বেদান্ত সাধনায় দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ একই সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মতত্ত্বিক সাধনায়ই আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মতেও সাধনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম সাধনার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে সকল ধর্মই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা। তাই তিনি উদার কষ্টে বলেছেন, ‘সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ।’ তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা তাঁদের মতো পোশাকও পরতেন না। এমনকি তিনি স্তু সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। ধর্মের জটিল তত্ত্ব তিনি গঁথের মাধ্যমে সহজ করে বোঝাতেন। ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা – এই ছিল তাঁর দর্শন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই ধর্মীয় আদর্শ জগন্মাসীকে শুনিয়ে গেছেন, যার ফলে তাঁর এই জীবসেবার আদর্শ অর্থাৎ মানবধর্ম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেন, ‘তিনি যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন থেকে সব ভেদাভেদে উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।’

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধন-দর্শনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকেন। তাঁর উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরো অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সৎস্পর্শে এসেছিলেন। ফরাসি মনীষী রম্মারল্লাং বিবেকানন্দের কাছ থেকে শুনে এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক বহুদাকার ইষ্ট রচনা করেন।

ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣେର ବାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଖେର କଥା ନୟ, ସେଣ୍ଠଳୋ ତାଁର ଜୀବନଚର୍ଚ୍ୟ ରୂପାୟିତ ସତ୍ୟ । ତିନି ଅହଙ୍କାରଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଜୀବକେ ଶିବଜ୍ଞାନେ ସେବା କରେଛେ । ଦରିଦ୍ରଦେର ଦେଖିଲେ ତାଁର ମନ କାନ୍ଦିତ । ଏକବାର ତିନି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନେ ଯାଇଲେନ । ସଙ୍ଗେ ରାନି ରାସମଗିର ଜାମାତା ମଥୁରବାବୁ । ତାଁରା ତଥିନ ଦେଓଘରେ । ଗ୍ରାମେର ଦରିଦ୍ର ମାନୁଷେର ଦୁଃଖ-ଦୁର୍ଦ୍ଶା ଦେଖେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମନେ ଖୁବ ବ୍ୟଥା ପେଲେନ । ତିନି ମଥୁରବାବୁକେ ବଲଲେନ ଦରିଦ୍ରନାରାୟଣେର ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ । ମଥୁରବାବୁ ତାଇ କରଲେନ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কালীর সাধক। কালীমূর্তিতে তিনি পুজো দিতেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি মায়ের সাধনা করতেন। তাই বলে মূর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। কেশবচন্দ্রই প্রথম তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রচার করেন। এ থেকেই বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর সাধন-প্রণালী এবং ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম সমষ্টয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বড় অবদান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। তিনি দেখতেন মানুষের অস্তর। তাই তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ সব শ্রেণির মানুষ আসত। তাইতো দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল সবার জন্য উন্নত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে জগন্নাতাকে দর্শন করতেন। নারীমাত্রই তাঁর কাছে ছিল মাতৃস্বরূপ। তাইতো নিজের স্ত্রীকেও তিনি মাতজ্ঞানে পূজো করেছিলেন। জগতে এরূপ ঘটনা দ্বিতীয়টি আর নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ‘যখন বাইরে লোকের সঙ্গে ঘিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। ঘিশে যেন এক হয়ে যাবে। বিদ্বেষভাব রাখবে না। ও সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দ, ও মুসলমান, ও খ্রিস্টান – এই বলে কাউকে ঘণা করবে না।’

শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে উদার মনোভাব, এর দ্বারা ভারতের লোকজন দারুণতাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁর অমত বাণী শ্রবণ করেছেন। অন্তরে পরম শান্তি পেয়েছেন।

ଶୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟରାଇ ନନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଉଦାର ଧର୍ମମତ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶିରାଓ ବିମୋହିତ ହେୟଛେ । ଏକ ରାଶିଆନ ଅଧ୍ୟାପକ ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକଥାମୃତ’ (ଗସ୍ତପେଲ ଅଫ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ) ପଡ଼େ ବଲେଛେନ, ‘ଏତ ଉଦାର, ଏତ ବିଶ୍ୱଜନୀନ, ସର୍ବଜନୀନ ଭାବ ଆର କୋଥାଓ ଦେଖା ଯାଯ ନା ।’ ଏକଜନ ଇଞ୍ଚାଦି ବଲେଛେନ, ‘ଇଜରାଇଲେ ଏକଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ସେନ୍ଟାର ହେୟା ଉଚିତ ।’ ଏକଜନ ଆଫ୍ରିକାନ ବଲେଛେନ, ତିନିଓ ତାଁର ଦେଶେ ଏକଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଦାନ୍ତ ସେନ୍ଟାର ଖଲତେ ଚାନ ।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই মহাপুরূষ পরলোক গমন করেন। তাঁর সাধনাঞ্চান দক্ষিণেশ্বর এখন অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর। জগত্কূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।
২. মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।
৩. ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুন্দ হয়, পবিত্র হয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুন্দ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চঙ্গাল চঙ্গাল নয়। ভক্তি হলে চঙ্গালের অন্নও খাওয়া যায়।
৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। প্রত্যেক ধর্মই সত্য।
৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছানো যায়। ‘যত মত তত পথ’।
৬. পিংপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশে আছে। বালিতে-চিনিতে মেশানো। পিংপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
৭. জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই। কিন্তু নৌকার ভেতরে যেন জল না ঢোকে। তাহলে নৌকা ডুবে যাবে।
৮. ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভালো লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে দেখা যায়।
৯. ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুরুরের চারাটি ঘাট। হিন্দুরা জল নিচ্ছে একঘাটে, বলছে জল; মুসলমানরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে পানি; ইংরেজরা আর একঘাটে নিচ্ছে, বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক একঘাটে নিচ্ছে, বলছে Aqua। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শুন্দা করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বরলাভ। এতে জাতিভেদ থাকবে না। ভক্তের কোনো জাতি নেই। ঈশ্বরের বহু নাম। ভক্তিভরে যে-কোনো নামে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। সকল ধর্মে ভক্তি থাকলে ভক্তিতে দেহ, মন, আত্মা শুন্দ হয়। দরিদ্র নারায়ণ, তার সেবা করতে হবে। এতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীতিশিক্ষা অনুসরণ করব। তাহলে আমরা যথার্থ মানুষ হতে পারব।

পাঠ ১১ : শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোষ্ঠামী

বাংলা ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। তখন ছিল পূর্ণিমা তিথি। নবদ্বীপের শান্তিপুরে প্রতি বৈশ্বণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বুলন যাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই উৎসবমুখর পুণ্য তিথিতে ভোর বেলায় বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দকিশোর গোষ্ঠামী ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। মা স্বর্ণময়ী দেবীও ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ দয়াবতী রমণী।

বিজ্ঞানের প্রামাণ্য পাঠ্যশালার শিক্ষার্থীদের করেন। তারপর অর্তি হয় শান্তিগুর টোলে। সেখানের পড়া
শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্তি হয় কোলকাতার সংকৃত কলেজে। এ-সময় তাঁর বিদ্যে হয়। শ্রী যোগমাত্রা
হিসেন শিকারগুরুর রামচন্দ্র ভাদ্যুলীর কল্প।

সংকৃত কলেজে বিজ্ঞান পড়ার পর
বিজ্ঞানের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।
সেখানে করেক্ষণ বছুকে নিরে
‘হিতসকারিনী’ শাখে এক সভা হালন
করেন। সভার সিঙ্গার হিল: যিনি যা সত্য
বলে বুঝবেন, তিনি তা ধারণে কার্য
পরিপন্থ করবেন। এই সভার বিজ্ঞানের
এক সুগাতকারী সিঙ্গার মেম। তিনি বলেন,
‘গৈতা আজিজেসের টিক। তাই আমাদের
গৈতা জ্যোৎ করা উচিত।’ এ-কথা অনে
কৌরা ত্রায়ণ হিসেন তাঁরা সবাই গৈতা কেলে
মেম। সেই সবারে ত্রায়ণ হয়ে গৈতা কেলে
মেম। এক সুসাহসিক কাজ হিল।

এই সবার ত্রায়ণমাজের সঙে বিজ্ঞানের
বোধায়োগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও কেশবচন্দ্রের বজ্ঞা অনে তাঁর মনে
পরিবর্তন আসে। তিনি ত্রায়ণের ধৃতি
অনুরক্ত হন এবং ত্রায়ণ এহণ করেন।



বিজ্ঞানকের এই গৈতা বর্জন ও ত্রায়ণ এহন তাঁর আচীন-বজ্ঞনী ভালো চোখে দেখেন নি। বিজ্ঞানের
এ-সময় শান্তিগুরে এলে তাঁর ধৃতি তাঁরা কিন্তু হয়ে গঠনে। বিজ্ঞানকে তাঁর মত ও বিশ্বাসের ব্যাপারে
আলোচ করেন নি। তিনি কোলকাতা ছেলে আসেন।

তখন বিজ্ঞানকের মেডিকেলের মূল্য পর্যাপ্ত সাময়ে। তিনি ধৃতি হয়েন। যিনি ত্রায়ণমাজ থেকে স্বাক
ঝল ধর্ম ধাচারের। চিকিৎসক জীবনের উচ্চল ভবিষ্যতের কথা তিনি না করে বিজ্ঞানক ত্রায়ণ ধাচারের
দায়িত্ব এহণ করেন। তিনি হিসেন ত্রায়ণমাজের আচার্য বিজ্ঞান। চাকা, বরিশাল, বশোর, খুলনা এবং
ভাবাজের বিকির্ণ অঞ্চলে তিনি ত্রায়ণ ধাচার করেন। অনেককে তিনি ত্রায়ণের সীকৰিত দেন।

বিজ্ঞান এক সময় উত্তরাঞ্চলে অবহান করছিসেন। তখন তিনি এক কঠিন অসুখে পড়েন। সেবার
১ বামদীর শ্রীলোকনাথ ত্রায়ণ ধৃতির ফুলাম তিনি সুজ হন। এ অসুখ তাঁর জীবনে এক গভীর অভাব দেন।

বাবা লোকনাথ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর মধ্যে আবার বৈষ্ণব ভাব জেগে উঠে। এ-সময় গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যোগী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে। তিনি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে পুনরায় হিন্দু যোগীতে পরিণত করেন। এরপর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ছেড়ে দেন।

এ-সময় বিজয়কৃষ্ণ স্তৰী, পুত্র-কন্যা এবং শিষ্যদের নিয়ে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়েন। তখন লোকনাথ বাবার নির্দেশে তিনি ঢাকার গেড়ারিয়ায় আশ্রম স্থাপন করে নামগান ও হরিসংকীর্তন করতে থাকেন। এতে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ঢাকায় তাঁর যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করলেও মাঝে মাঝেই তিনি কোলকাতা যেতেন। একবার স্তৰীকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে কলেরা রোগে স্তৰীর মৃত্যু হয়। তারপর ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্র পুরী চলে যান। সেখানে অতি অল্প সময়েই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন। উড়িষ্যা প্রদেশেও তাঁর প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এতে স্বর্ণাঞ্জিত হয়ে স্থানীয় ধর্মব্যবসায়ীরা একদিন তাঁকে বিষ মিশ্রিত লাঙ্গু খেতে দেয়। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩০৬ সালের (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২২এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ

১. হরিনামে প্রেম লাভের আটটি ক্রম -

ক. পাপবোধ	খ. পাপকর্মে অনুত্তাপ
গ. পাপে অপ্রবৃত্তি	ঘ. কুসঙ্গে ঘৃণা
ঙ. সাধুসঙ্গে অনুরাগ	চ. নামে রঞ্চি ও গ্রাম্য কথায় অরঞ্চি
ছ. ভাবোদয়	জ. প্রেম।

২. অন্তরে হিংসা থাকলে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্যও হন্দয় হিংসাশূন্য হয়, তখন লীলা দর্শন হতে পারে।

৩। কখনো পরিনিন্দা করবে না।

৪। সত্য কথা বলবে ও সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে।

৫। সর্বদা নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের নাম করবে।

৬। সর্বজীবে দয়া করবে।

৭। বৃথা অহংকার করবে না।

৮। শান্ত ও মহাজনদের বিশ্বাস করবে।

ପାଠ ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ : ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ

ବହୁରୂପେ ସମ୍ମୁଖେ ତୋମାର, ଛାଡ଼ି କୋଥା ଖୁଜିଛ ଈଶ୍ଵର?
ଜୀବେ ପ୍ରେମ କରେ ସେଇ ଜନ, ସେଇ ଜନ ଦେବିଛେ ଈଶ୍ଵର॥

ଜୀବେର ଅତି ପ୍ରେମ-ଭାଲୋବାସା, ଈଶ୍ଵରଙ୍ଗାନେ ଜୀବସେବାର ଏମନ କଥା ଆର କେ କବେ ବଲେଛେ? ବଲେଛେ ଏକଜନଇ ।

ଏହି ଅମର ବାଣୀର ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଚ୍ଛେ
ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । ୧୮୬୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟବୟଦେର ୧୨
ଜାନୁଆରି କୋଲକାତାଯ ତାଁ ଜନ୍ମ । ପିତା
ବିଶ୍ୱନାଥ ଦନ୍ତ ଛିଲେନ କୋଲକାତା
ହାଇକୋର୍ଟେର ଏକଜନ ବିଖ୍ୟାତ ଉକିଲ ଏବଂ
ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଛିଲେନ ଏକଜନ
ସୁଗୃହୀଳୀ ।

ବିବେକାନନ୍ଦେର ପ୍ରକୃତ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦନ୍ତ ।
ତିନି ଛିଲେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ । ବିଶେଷ କରେ
ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରେ ତାଁ ଅଗାଧ ପାଞ୍ଜିତ୍ୟ ଛିଲ । ତିନି
ସବୁ ଜେନାରେଲ ଏୟାସେସଲି କଲେଜ(ବର୍ତମାନେ
କ୍ଷଟିସ ଚାର୍ଚ କଲେଜ)-ଏର ଛାତ୍ର, ତଥନ କଲେଜେର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚଲିଯାମ ହେଛି ଏକ ବିତର୍କସଭାୟ
ନରେନ୍ଦ୍ରେର ପ୍ରତିଭାୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଁ ବଲେଛିଲେନ,
ଜାର୍ମାନ ବା ଇଂଲନ୍ଡର କୋନୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ
ତାଁ ମତୋ କୋନୋ ଛାତ୍ର ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାବେ
ନା ।

ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ୧୮୮୪ ସନେ ବିଏ ପାଶ କରେନ ।
ତାଁ ଆଗେଇ ତାଁ ମଧ୍ୟେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଦେଖା ଦେଇ । ତିନି କେବଳ ଈଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କେ

ଚିନ୍ତା କରେନ । ଈଶ୍ଵର କି ଆହେ? ତାଁକେ କି ଦେଖା ଯାଇ? ଏ ଧରନେର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଁର ମନକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ । ତିନି
ଅନେକକେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ କାରୋ ଉତ୍ତର ତାଁର ମନଃପୁତ ହୟନି । ଏମନ ସମୟ ଏକଦିନ ତାଁର ଦେଖା
ହୟ କାଳୀର ସାଧକ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ତଥନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର କାଳୀବାଡ଼ିତେ ଥାକେନ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ଏକଦିନ ଚଲେ ଯାନ ମେଥାନେ । ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ତିନି ସରାସରି ଜିଜ୍ଞେସ କରେନ, ‘ଆପଣି କି ଈଶ୍ଵର ଦେଖେଛେ?’
ରାମକୃଷ୍ଣ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେନ, ‘ହଁ, ଦେଖେଇ; ଯେମନ ତୋକେ ଦେଖଇ । ଚାଇଲେ ତୋକେଓ ଦେଖାତେ ପାରି’ ।

ଏହି ସାଦାସିଧେ ସାଧକ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଭାଲୋ ଲାଗେ । ତାଁ ପ୍ରତି ଏକଟା ଭକ୍ତିର ଭାବ
ଜେଗେ ଓଠେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥକେ ପେଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁଶି ହନ । ତିନି ଯେନ ଏତଦିନ ତାଁରି ଅପେକ୍ଷାଯ
ଛିଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିୟମିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରେ ଯାତାଯାତ ଶୁରୁ କରେନ । ଏକ ସମୟ ତିନି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିକଟ ତ୍ୟାଗେର
ମଧ୍ୟେ ଦୀକ୍ଷା ନେନ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହନ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସମ୍ମାନୀ । ତଥନ ତାଁ ନାମ ହୟ ବିବେକାନନ୍ଦ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ
ଭକ୍ତରା ତାଁକେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବଲେଇ ଡାକତେନ ।



বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘূরলেন। নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখলেন। কীভাবে এ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর এক সময় কন্যাকুমারীকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ঐ শিলাখণ্ডের নাম এখন ‘বিবেকানন্দ শিলা।’ ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাজানে মানবসেবা। এই ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বুঝতে পারলেন, বৈরাগ্য ও সেবাধর্ম হচ্ছে ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শ এবং এ পথেই তাদের জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরম্পরার ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমগ্র ও শান্তি।’ তিনি আরো বলেন, ‘খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুক্ত হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। আমেরিকার ‘নিউইয়র্ক হেরাল্ড’ পত্রিকা মন্তব্য করে, ‘স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার পর মনে হবে ভারতের মত জ্ঞানেশ্বর্যমণ্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্মপ্রচারক পাঠানো নির্বাঙ্গিতার কাজ।’

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে তাঁকে ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’ নামে অভিহিত করা হয়। বিবেকানন্দ তাঁর মতাদর্শ প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে ‘বেদান্ত সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে একের পর এক বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত সত্য তুলে ধরেন। বেদান্তের মূল কথা হলো – ‘জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই; জীবই ব্রহ্ম।’ তাই ব্রহ্মজানে জীবসেবা করতে হবে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মূর্তির পূজা করে না, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। তাঁর বক্তৃতা থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উন্মুক্ত হন যে, নিজের জনন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে বিশাল সমর্ধনা দেয়। তার উত্তরে তিনি সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, ‘শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও

କାପୁରୁଷତାଇ ପାପ । ସ୍ଵାଧୀନତାଇ ଧର୍ମ, ପରାୟନତାଇ ପାପ । ପରୋପକାରଇ ଧର୍ମ, ପରପୀଡ଼ନଇ ପାପ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ - ଏ-ଦୁଟି ଜିନିସଇ ଉଲ୍ଲତି ଲାଭେର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ।'

ବିବେକାନନ୍ଦ ବଲତେନ, ସତ୍ୟଇ ସକଳ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି । ସେ ହେଁଆ ଆର ସେ କର୍ମ କରା ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ । ତିନି ଅଥର୍ବବେଦେର ଉଦ୍‌ଧୂତି ଦିଯେ ବଲେଛେ, 'ଅସତ୍ୟ ନୟ, ସତ୍ୟେରଇ ଜୟ ହୟ; ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ଈଶ୍ୱର ଲାଭେର ପଥ ପ୍ରସାରିତ ହୟ ।' ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତେର ଜନ୍ୟ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର 'ଆମିକେ' ତ୍ୟାଗ କରତେ ପାରେ, ସେ ଦେଖେ ସମସ୍ତ ଜଗଂ ତାର । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ ଏବଂ ସାହସୀ, ସେଇ ସବ କିଛୁ କରତେ ପାରେ ।

ବିବେକାନନ୍ଦେର କାହେ କୋନୋ ଜାତିଭେଦ ଛିଲ ନା । ତିନି ବଲତେନ - ନୀଚ ଜାତି, ମୂର୍ଖ, ଦାରିଦ୍ର, ଅଞ୍ଜ, ମୁଢି, ମେଥର ସକଳେଇ ଆମାଦେର ଭାଇ । ଏଦେର ସେବାଇ ପରମ ଧର୍ମ । ତାର ଏହି ଆଦର୍ଶେ ଉତ୍ସୁଦ୍ଧ ହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେରାପୀଡ଼ିତ ଚଞ୍ଚଳଦେର ପାଶେ ବସେ ତାଦେର ସେବା କରେଛେ । ବିବେକାନନ୍ଦେର ମୃତ୍ୟୁର ଦଶ ବହୁ ପରେ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ତାର ରଚନାବଳି ପଡ଼େ ଅନୁଭବ କରତେ ପାରେନ ଯେ, ମାନବସେବାଇ ହଚେ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ । ତାଇ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ସେବାକେଇ ତିନି ତାର ଜୀବନେର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରେନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ 'ନେତାଜି' ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତ ହନ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ନାରୀ-ସ୍ଵାଧୀନତାଯ ବିଶ୍ୱାସୀ ଛିଲେନ । ନାରୀଶିକ୍ଷାକେ ତିନି ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ସମର୍ଥନ କରତେନ । ବୈଦିକ ଯୁଗେର ମୈତ୍ରୀ, ଗାଗୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଦୁଷୀ ନାରୀର ଉତ୍ସ୍ଲେଷ କରେ ତିନି ବଲେଛେ - ସେଇ ଯୁଗେ ନାରୀରା ଯଦି ଏତ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରତେ ପାରେ, ତାହଲେ ଏଯୁଗେର ନାରୀରା ପାରବେ ନା କେନ? ତାର ମତେ ଯେ-ଜାତି ନାରୀଦେର ସମ୍ମାନ ଦେଯ ନା, ସେ-ଜାତି କଥନୋ ବଡ଼ ହତେ ପାରେ ନା । 'ନାରୀଦେର ଅବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲତି ନା କରେ ବିଶ୍ୱେର ମଙ୍ଗଳସାଧନ କରା ସମ୍ଭବ ନୟ । କୋନ ପାରି ଏକଟି ଡାନା ନିଯେ ଉଡ଼ିତେ ପାରେ ନା ।' ଏମନକି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାୟ ନାରୀରା ଯାତେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏବଂ ଏଗିଯେ ଆସେ ତାର ଜନ୍ୟ ତିନି ସାରଦାଦେବୀର ପରିଚାଳନାୟ ନାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୀ ପରିକଳ୍ପନା କରେଛିଲେନ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶେର ଉଲ୍ଲତିର ଜନ୍ୟ ସମାଜ ସଂକ୍ଷାରେର କଥାଓ ଭାବତେନ । ତିନି ବଲତେନ - ଦେଶେର ଉଲ୍ଲତି କରତେ ହଲେ ସବ ଭରେର ମାନୁଷେର ଉଲ୍ଲଯନ ପ୍ରଯୋଜନ । ତିନି ସମାଜେର ନୀତୁ ଭରେର ମାନୁଷଦେର ପ୍ରତି ଉଁଚୁ ଭରେର ମାନୁଷେର ଅତ୍ୟାଚାରେର ପ୍ରତିବାଦ କରେଛେ । ସାରା ଦେଶ ଘୁରେ ତିନି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣିର ମାନୁଷେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଛେ । ତାଦେର ପରିଶ୍ରମ କରାର କ୍ଷମତା ଦେଖେ ତିନି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରେଛେ ଯେ, ଏକ ସମୟ ଏହାଇ ଭାରତବର୍ଷ ଶାସନ କରବେନ । ତାଇ ତିନି ବଲେଛେ, '... ନୂତନ ଭାରତ ବେଳକ । ବେଳକ ଲାଗୁ ଧରେ, ଚାଷାର କୁଟିର ଭେଦ କରେ, ଜେଲେ ମାଲା ମୁଢି ମେଥରେର ଝୁପଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ହତେ । ବେଳକ ମୁଦିର ଦୋକାନ ଥେକେ, ଭୁନାଓୟାଲାର ଉନୁନେର ପାଶ ଥେକେ । ବେଳକ କାରଖାନା ଥେକେ, ହାଟ ଥେକେ, ବାଜାର ଥେକେ । ବେଳକ ଘୋପ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥେକେ ।'

୧୦
ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଦିଯେ ଅନୁଭବ କରତେ ପେରେଛିଲେନ ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ କୋନୋ ଜାତିର ଉଲ୍ଲଯନ ସମ୍ଭବ ନୟ ।
ତାଇ ତିନି ବଲତେନ - ଦେଶେର ଜନଗଣକେ ଶିକ୍ଷିତ କରେ ତୁଳତେ ହବେ, ତବେଇ ଏକଟି ଉଲ୍ଲତ ଜାତି ଗଡ଼େ ତୋଳା

সম্ভব হবে। শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবাই যাতে সমান শিক্ষা পায়। তাই তিনি বলতেন— ব্রাহ্মণের ছেলের যদি একজন শিক্ষকের দরকার হয়, তাহলে শুন্দের ছেলের দুজন বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি চাইতেন— ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকুক, তবে ব্রাহ্মণ যেন চেষ্টা করেন শুন্দকেও তাঁর নিজের পর্যায়ে তুলে আনতে। নিজে মানুষ হওয়া এবং অন্যকেও প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করা— এটিই হওয়া উচিত মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবেকানন্দ অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন— দরিদ্ররা যদি স্কুলে না আসতে পারে তাহলে শিক্ষাকেই তাদের কাছে পৌছে দিতে হবে, কলে-কারখানায়, ক্ষেত্রে-খামারে যেখানে তারা কাজ করে সেখানে। তিনি আরো বলেছেন, ‘সামর্থ্য না থাকলে একটি কুঁড়ে ঘর বানাও। সেখানে গরিব লোকেরা সাহায্য নিতে ও উপাসনা করতে আসবে। সেই মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা ধর্মকথা ও পুরাণকথা পাঠ হবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেবে।’

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি বলেছেন, ‘অন্ন চাই! অন্ন চাই! দরিদ্রের মুখে অন্ন জোগাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম। যারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের আমরা ধর্মোপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছি। ধর্মমতবাদে কি পেট ভরে? সব কিছুরই প্রথম অংশ পাবে দরিদ্র। আমাদের অধিকার শুধু অবশিষ্টাংশে। দরিদ্ররা ঈশ্বরের প্রতিভূত; যেই লাঙ্গনা ভোগ করে সেই ঈশ্বরের প্রতিভূত। দরিদ্রকে না দিয়ে যে আহারে আনন্দ পায় সে পাপে আনন্দ পায়।’

১৮৯৭ সনে বাংলার কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন। আলমোড়া থেকে তাগিনী নিবেদিতাকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন, ‘আমি আমার কিছু ছেলেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলাগুলিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছি। এটা ইন্দ্রজালের মত কাজ করছে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই দেখছি। দেখছি একমাত্র হৃদয়ের মধ্য দিয়ে জগতের কাছে পৌছানো যায়।’

বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন। তবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের পাশাপাশি তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার কথাও বলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন, ‘বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের সন্তানসন্ততি ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিথারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ... লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তানসন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে।’ শুধু তা-ই নয়, তিনি বলেছেন, ‘ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলে গণ্য হওয়া উচিত।’

এভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংক্ষার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের মতো কেবল ঈশ্বর-সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এমনটাই চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য ১৮৯৭ সনে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর একটি মঠও প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি ‘বেলুড় মঠ’ নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাংলাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবী ব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপত্তিকালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের বিপুল অধ্যাত্মিক ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মা সেদিন জেগে উঠেছিল। দেশের ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আত্মবিস্মৃত জাতি সেদিন দেশের সনাতন ধর্মজীবন থেকে প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিবেকানন্দ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুবতেন না। তাই বিশ্রামের অভাবে অল্পদিনেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে এই মহামনীষী দেহ ত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী

- ১। ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।
- ২। ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ো না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভেতর রয়েছে – এ- কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই শক্তি জেগে উঠবে।
- ৩। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ।
- ৪। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারা যায়, সে-ই হচ্ছে শিক্ষা।
- ৫। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়।
- ৬। ভেবো না তোমরা দরিদ্র, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখেছে – টাকায় মানুষ করেছে! মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে। প্রাচীন ধর্ম বলত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলছে, যে আপনাতে বিশ্বাস না করে সে-ই নাস্তিক।
- ৭। বিশ্বাসই হলো মানবসমাজ ও সব ধর্মের সবচেয়ে বড় শক্তি।
- ৮। জীবসেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। ‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। জীবসেবা মানেই ঈশ্বরসেবা। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দারিদ্র্য দূর করতে হবে। কারণ খালি গেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, ঘৃত-মেথরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। আজ্ঞাবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করব। প্রতিটি কাজে-কর্মে এর প্রতিফলন ঘটাব। তাহলে আমরাও জীবনে সফল হতে পারব।

পাঠ ১৫ ও ১৬ : শ্রীমা

১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিস শহরে শ্রীমা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীরা। ভারতের পঞ্জিচৌরীতে অরবিন্দ আশ্রমে এসে তাঁর নাম হয় শ্রীমা। ভক্তরা তাঁকে এ নামেই ডাকতেন। ভারতবাসীর কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত।

শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠে। তাঁর বয়স যখন মাত্র চার, তখনই তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। আর পাঁচজন শিশুর মতো শৈশবেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি

তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল
না। এতে তাঁর বাবা-মা
নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। শুধু
পড়াশোনা নয়, পার্থিব কোনো
কিছুর প্রতিই শ্রীমার কোনো
আসঙ্গ ছিল না। তিনি শুধু
ঈশ্বর চিন্তা করতেন।
আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন
থাকতেন।

প্যারিস শহরের বাইরে ছিল
এক প্রকাণ্ড বন। শ্রীমা সময়
পেলেই সেখানে গিয়ে
গাছতলায় ধ্যানে বসতেন।



তখন পাখিরা নির্ভয়ে এসে তাঁর শরীরে বসত। কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি করত তাঁর ওপর দিয়ে। এমনিভাবে বনের গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে তাঁর এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

মায়ের বয়স যখন উনিশ বছর, তখন তিনি আলজিরিয়ার ক্লেমসেন শহরে যান। সেখানে তেও নামে এক বিখ্যাত গুণীন থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি হঠযোগ ও অনেক গুণবিদ্যা শিক্ষা করেন।

দেশে ফিরে শ্রীমা আরো গভীর সাধনায় মগ্ন হন। তিনি উপলক্ষ্মি করেন যে, ঈশ্বর আছেন। তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক মিলন সম্ভব। ঈশ্বরকে তিনি সব সময় জ্যোতির্ময়রূপে দেখতে চান। একবার তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি যেন তাঁকে বলছেন: ওঠ, আরো ওপরে ওঠ। সকলকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠ, কিন্তু সকলের মধ্যে ব্যাঙ্গ করে দাও নিজের আআকে।

শ্রীমা এবার ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পড়তে শুরু করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান ভারতবর্ষে আসার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শ্঵ামী মঁসিয়ে পল রিশারকে নিয়ে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা ২৯শে মার্চ পঞ্জিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে ঝৰি অরবিন্দকে দেখে শ্রীমার স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ দিব্যকর্ম করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তিনি উপলক্ষ্মি করলেন, অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে তাঁর আআর মুক্তি। সারা পৃথিবীর মধ্যে পঞ্জিচেরীর আশ্রমকেই তাঁর কাছে স্বর্গ মনে হলো। এই শান্ত তপোবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি, তাঁর আআর চূড়ান্ত সার্থকতা। তাই তাঁরা দুজনেই অশ্রমে থেকে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন। তাঁর সাধন কর্মের সহযোগী হয়ে উঠলেন। তখন আশ্রম থেকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ‘আর্য’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তাঁরা দুজনেই এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অরবিন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন।

কিন্তু এ যাত্রায় শ্রীমা বেশিদিন ভারতে থাকতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তাঁদের প্যারিসে ফিরে যেতে হলো। এতে মা-র মন খুব আকুল হয়ে উঠে। শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিচ্ছেদের মতো মনে হতে লাগল। তিনি আকুল নয়নে পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

এভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। হঠাতে অরবিন্দের কাছ থেকে তিনি আহ্বান পেলেন ভারতবর্ষে আসার। তাঁর মন উঠেল হয়ে উঠল। আর বিলম্ব নয়। তিনি যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল তিনি পঞ্জিচেরীতে পৌছান। তাঁর মন শান্ত হলো। এবার গুরুদেবের নির্দেশমতো তিনি নিয়মিত যোগ সাধনা শুরু করে দিলেন। ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতীয় যোগিনীর বেশ ধারণ করলেন। তাঁর পরনে তখন দেশি শাড়ি ও ব্লাউজ। খাদ্যদ্রব্যও দেশীয়।

আমিষের পরিবর্তে নিরামিষ । পরে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে মা ইউরোপীয় পোশাকও পরতেন । কারণ অরবিন্দ বলতেন, ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করতে পারলে বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু যায়-আসে না ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন । সেদিন থেকেই একটি ঘরে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন । ফলে আশ্রমের সমস্ত ভার পড়ে শ্রীমার ওপর । শ্রীমাও সর্বান্তকরণে সে ভার গ্রহণ করেন । তিনি পৈতৃক সূত্রে অনেক সম্পদ ও অর্থ পেয়েছিলেন । তা দিয়ে তিনি আশ্রমের খরচ চালাতে লাগলেন । দিনদিন আশ্রমে লোকজন বাড়তে লাগল । শ্রীমাও অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সকলের ভরণ-পোষণ করে যেতে লাগলেন । কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে তিনি পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন । খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খুলে শ্রীমা আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুললেন ।

শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয় । এজন্য যোগব্যায়াম প্রয়োজন । তাই আশ্রমে তিনি একটি ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন ।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমা আশ্রমে একটি ছেট পাঠশালা খোলেন । সেখানে ছেলে-মেয়েরা মনের অনন্দে লেখাপড়া করত । ক্রমে পাঠশালা থেকে বিদ্যালয় ও পরে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় । তার নাম হয় ‘আন্তর্জাতিক শিল্পকেন্দ্র’ । এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় । তবে সবাইকে আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা হয় । শ্রীমা এখানে ধর্ম ও কলাবিদ্যার এক সার্থক সমষ্টয় সাধন করেছিলেন । এখানে বিশ্বের যে-কোনো শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারে ।

আশ্রমবাসীদের চিকিৎসার জন্য শ্রীমা একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন । এ হাসপাতালে সকলকে বিনামূলে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় ।

আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যায়ভার আশ্রমই বহন করে । আশ্রমের নিজস্ব জমি, বাগান ও দুর্ঘ খামার আছে । সেসব থেকে চাল, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি পাওয়া যায় । অর্থাৎ শ্রীমা সত্যিকার অর্থেই আশ্রমটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন ।

আশ্রমের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো সমস্তরকম ভেদভানের বিলোপ । আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের সকলকেই কাজ করতে হয় । ছেট-বড় কাজে কোনো পার্থক্য নেই । যে-কেউ যে-কোনো কাজ করেন । ধর্মীয় গৌড়ামি বলতে কিছু নেই । মা চাইতেন আশ্রমবাসীরা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে সকল ধর্ম সম্পর্কে উদার ও শ্রদ্ধাশীল হোক । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষা নিয়ে আশ্রমের আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিক ।

আশ্রমের সকলকে মা সন্তানের ন্যায় ভালোবাসতেন । নিজের মায়ের মতোই তিনি সকলের সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । শুধু তা-ই নয়, আশ্রমের বৃক্ষ-লতা ও পশু-পাখির প্রতিও মায়ের গভীর ভালোবাসা ছিল । আশ্রমে নতুন অতিথি এলে মা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন, কেউ যেন এদের প্রতি অসম্মান না করেন । কেউ যেন গাছের পাতা বা ফুল না ছেঁড়েন বা অকারণে গাছের ডাল না ভাঙ্গেন ।

ମା ସବ ସମୟ କାଜ ନିୟେ ଥାକତେ ଭାଲୋବାସତେନ । ଦିନରାତ ଶୁଦ୍ଧ କାଜ ଆର କାଜ । କାଜଇ ଯେନ ଛିଲ ତାର ଜୀବନ । ଆଜୀବନ ତିନି କାମନାହୀନ କର୍ମଯଜ୍ଞ କରେ ଗେଛେନ ।

ମା ଶୁଦ୍ଧ ଏକଜଳ ଜ୍ଞାନତପଶ୍ଚିମୀ ବା ରଙ୍ଗ ଯୋଗିନୀଇ ଛିଲେନ ନା । ତାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚାଣ ସୌନ୍ଦର୍ୟବୋଧି ଛିଲ । ଏକ ନିବିଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ୟବୋଧେର ଦ୍ୱାରା ତିନି ବହିଃପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ଚମଞ୍କାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସାଧନ କରେ ଚଲତେନ । ତିନି ଚାଇତେନ ମାନୁଷେର ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିଓ ଏମନି ବାଇରେ ପ୍ରକୃତିର ମତୋ ସୁନ୍ଦର ହୁଁ ହେଁ । ଏଭାବେ ତିନି ଆଶ୍ରମଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ୟର ଏକ ଲୀଲାଭୂମିରାପେ ଗଡ଼େ ତୁଳେଛିଲେନ ।

ମାୟେର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିକଲ୍ପନା ଛିଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦେର ନାମେ ଅରୋଭିଲ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ୧୯୫୪ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ତିନି ଏ ପରିକଲ୍ପନା କରେଛିଲେନ । ଏର ଜନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେରୀର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିକେ ପ୍ରାୟ ଛୟ ମାଇଲ ଦୂରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳେ ୧୫ ବର୍ଗମାଇଲ ଭୂମି ସଂଘର୍ଷିତ କରା ହେଁ । ୧୯୬୮ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୮୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ଏର ଭିତ୍ତିଶାପନ କରା ହେଁ । ଭିତ୍ତିମୂଳେ ପୃଥିବୀର ୧୨୬୩ ଦେଶେର ମାଟି ଏନେ ଜଡ଼ କରା ହେଁ । ଐସବ ଦେଶେର ତରଣ-ତରଣୀରା ଏ ମାଟି ନିୟେ ଆସେନ । ୧୯୭୨ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୨୧୩୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାୟେର ଶୁଭ ଜାତ୍ରାଦିନେ ଏର ନିର୍ମାଣ କାଜ ଶୁରୁ ହେଁ ।

ମାୟେର ପରିକଲ୍ପନା ଛିଲ, ଅରୋଭିଲ ହବେ ଏକଟି ଆଧୁନିକ ନଗର । ଏଥାନେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚଶ ହାଜାର ଲୋକ ବାସ କରବେ । ସବାଇ ହବେ ଏକ ପରିବାରେର ସଦ୍ସ୍ୟ । ଏଥାନେ ଆଧୁନିକ ନଗରେର ସମ୍ମ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ଥାକବେ । ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପକଳା, ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ସବ କିଛିର ଚର୍ଚା ହବେ ଏଥାନେ । ଅରୋଭିଲ ହବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶ୍ଵମାନବେର । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ-ଏକ୍ୟେର ଜୀବନ୍ତ ଲ୍ୟାବରେଟରି । ଏଟି ହବେ ଏକଟି ଆତାନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନପଦ । ଏଥାନକାର ସକଳେଇ ହବେ ଏର ଜୀବନ୍ୟାତ୍ମା ଓ ଉତ୍ସନ୍ନିତିର ଅଂଶୀଦାର । ତାରାଇ ନାନାଭାବେ ଏର ସକଳ କାଜ କରବେ । କାଉକେ ଖାଜନା ଦିତେ ହବେ ନା । କାଉକେ ଖାବାର ଭାବନା ଭାବତେ କବେ ନା । ସକଳକେ ଖାଓୟାବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରହଣ କରବେ । ସକଳ ଦେଶେରଇ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ଓ ଖାଦ୍ୟରୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବଜାୟ ରାଖା ହବେ । ଅରୋଭିଲ ହବେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ଵାସେର ଉତ୍ତର୍ଭେଦ ଉଠେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟେର ସେବା ।

ମାୟେର ଏହି ପରିକଲ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଅରୋଭିଲ ନଗର ସତିଇ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ । ୨୦୦୬ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଏର ନିର୍ମାଣ କାଜ ଶେଷ ହେଁଥେ । ସେଖାନକାର ଅଧିବାସୀରା ମାୟେର ଆଦର୍ଶକେ ଶିରୋଧାର୍ୟ କରେ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ସଙ୍ଗେ ବସବାସ କରଛେନ ।

ଶ୍ରୀମା ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଁକତେ ପାରତେନ । ଗାନ୍ଧୀ ଜାନତେନ । ଭାଲୋ ଅର୍ଗାନ ବାଜାତେ ପାରତେନ । ପ୍ରତି ବହରେର ଶେଷ ଦିନ ରାତ ବାରୋଟାର ପର ତିନି ଅର୍ଗାନ ବାଜିଯେ ନତୁନ ବହରକେ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାତେନ । ବିଭିନ୍ନ ରଚନାଯ ତାର ସାହିତ୍ୟ-ପ୍ରତିଭା ଓ କବିତ୍ୱକ୍ଷରଣ ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଇ ।

ମାୟେର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମେ ପଣ୍ଡିତେରୀର ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସାରା ଭାରତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୁଅ ହିସେବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେ । ଏର ଆଦର୍ଶେ ଭାରତବର୍ଷେର ବିଭିନ୍ନ ହାନି ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗଡ଼େ ଉଠେ । ବାଂଗାଦେଶେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ରଯେଛେ । ଏହି ଆଶ୍ରମେ ଆଦର୍ଶ ଭାରତବାସୀଦେର ଜୀବନେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଫେଲେଛେ ।

୧୯୭୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୧୭୨ ନଭେମ୍ବର ପଣ୍ଡିତେରୀର ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମେ ଏହି ମହିଯୁସୀ ନାରୀର ଜୀବନାବସାନ ଘଟେ ।

ଶ୍ରୀମାର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଥେକେ ଆମରା ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ତା ହଲୋ: ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନେ ପରିବର୍ତ୍ତା, ଦୀଶରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସେବାକେ ଜୀବନେର ବ୍ରତ ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରା । ସାମହିକଭାବେ ନୈତିକ ଉତ୍ସନ୍ନିତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରା ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। ভগবানের পূর্ণবতার কে?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. মৎস্য | খ. বরাহ |
| গ. নৃসিংহ | ঘ. শ্রীকৃষ্ণ |

২। চৱক সংহিতা কয়টি ভাগে বিভক্ত?

- | | |
|---------|--------|
| ক. পাঁচ | খ. ছয় |
| গ. সাত | ঘ. আট |

৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের কারণ হচ্ছে -

- i. ধর্মকে সংস্থাপন
- ii. দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন
- iii. সজ্জনদের বিনাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। ‘মা শুরঞ্জন, ব্রহ্ময়ী-স্বরূপা’- এটি কার বাণী?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. শঙ্করাচার্য | খ. বিজয়কৃষ্ণ |
| গ. নৃসিংহ | ঘ. বিবেকানন্দ |

৫। লোকনাথ বাবার নির্দেশে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কোথায় আশ্রম স্থাপন করেন?

- | | |
|---------|-----------|
| ক. ঢাকা | খ. বরিশাল |
| গ. যশোর | ঘ. খুলনা |

৬। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে কাকে ‘সাইক্লোনিক হিন্দু’ নামে অভিহিত করা হয়?

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ক. প্রভু নিত্যানন্দ | খ. স্বামী বিবেকানন্দ |
| গ. শ্রীরামকৃষ্ণ | ঘ. শ্রীঅরবিন্দ |

সূজনশীল প্রশ্ন :

- ১। তমা লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে বাড়ির উঠানের একপাশে পাখিদের জন্য খাবার দিয়ে রাখে। পাখিরাও নিয়মিত এসে খেয়ে যায়। এতে সে পরম আনন্দ লাভ করে। হঠাৎ তমার বাবা তমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করলে তমা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের হস্তক্ষেপে তমার অধিকার রক্ষা পায়।
 - ক. বিবেকানন্দ ‘বেদান্ত সমিতি’ নামে একটি সংগঠন কোথায় স্থাপন করেন?
 - খ. শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের ভক্তিভাব গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - গ. অনুচ্ছেদে তমার পাখিপ্রীতি স্বামী বিবেকানন্দের কোন মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত? তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের কোন আদর্শ তমার শিক্ষকের চরিত্রে এবং কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।
- ২। ধর্মবিষয়ক শিক্ষক দীনেশচন্দ্র নবম শ্রেণিতে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে এমন একজনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন, যিনি ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে একজন জ্ঞান তপস্থিনীর বেশ ধারণ করেন এবং একটি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আশ্রমাটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে। এমনকি তার সৌন্দর্যবোধ ও অভাবনীয় পরিকল্পনায় একটি নগরও গড়ে উঠে।
 - ক. শ্রীবিজয় কৃষ্ণের পিতার নাম কী?
 - খ. বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন?
 - গ. অনুচ্ছেদে ধর্মীয় শিক্ষক যে সাধক-সাধিকার কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন তাঁর সাধনজীবন তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. নগর প্রতিষ্ঠায় উক্ত সাধক-সাধিকার অবদান মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
৯ম-১০ম হিন্দুধর্ম

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ
– শ্রী রামকৃষ্ণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্বাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য